

গাউছিয়ত নীতি

(স্মারক গ্রন্থ)

সংকলন ও সম্পাদনা:
সৈয়দ ইরফানুল হক
মাইজভাণ্ডারী

গাউছিয়ত নীতি

স্মারক গ্রন্থ

সংকলন ও সম্পাদনাঃ

সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবার
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

প্রকাশনায় :

দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

৬/জি, জাকির হোসেন সোসাইটি
রোড নং ০৪, দক্ষিণ খুলশী
চট্টগ্রাম ।

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

পৃষ্ঠপোষক
সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

সম্পাদক
সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী
নায়েব সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল,
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

গ্রন্থস্বত্ব © দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩ ইংরেজি (১ মাঘ ১৪২৯ বাংলা)
দ্বিতীয় সংস্করণ
৫ জুন ২০২৪ ইংরেজি (২৭ জ্বিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি)

বর্ণবিন্যাস, প্রচ্ছদ ও মুদ্রণে
মাইজভাণ্ডারী প্রকাশনী
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : +৮৮ ০১৮১৯ ২৮৯৭১৬, +৮৮ ০১৭১১ ৮১৭২৭৪
E-mail : tasauf.darulirfan@gmail.com
Website : www.diri.ord.bd

মূল্য : ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)
US Dollar $ 10.00

Ghawthiat Niti (Memorial Book)
Edited By Shahjada Syed Irfanul Hoque Maizbhandari
Published by Darul Irfan Research Institute (DIRI)
2nd Edition Print : 5 June 2024 (27 Ḏū al-Qaʿdah 1445 AH)
ISBN : 978-984-35-3673-0

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
০১	সম্পাদকীয়		১০
০২	পৃষ্ঠপোষকের ভাষ্য		১৬
০৩	'উছুলে ছাবয়া' বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি	সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী	১৮
০৪	গাউছিয়ত নীতি	সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী	২৩
০৫	আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে 'গাউছিয়ত নীতি'র ভূমিকা	সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী	২৪
০৬	আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে 'ফানায়ে ছালাছা'র অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য	কাজী মোহাম্মদ মঈনুদ্দীন আশরাফী	২৯
০৭	তরিকতের আলোকে ধর্মীয় স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ	ডা. মোহাম্মদ শফিউল হাসান	৩৫
০৮	যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগরণে 'গাউছিয়ত নীতি'র ভূমিকা	ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ	৩৯
০৯	পরিবেশ সুরক্ষায় অপচয়রোধে 'ফানা আনিল হাওয়া'র গুরুত্ব	মো. ইকবাল সরোয়ার	৫৫
১০	'ফানা আনিল খাল্ক' অবলম্বনে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত শক্তি সামর্থের উপর আস্থাশীলতার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন	সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী	৬০
১১	'ফানা আনিল খাল্ক' এর আলোকে পরমুখাপেক্ষীতা বর্জন ও সৎরুজি অর্জন	ড. মুহাম্মদ ইছমাইল নোমানী	৭৩
১২	আত্মশুদ্ধি অর্জনে 'ফানা আনিল এরাদা'র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় অনস্বীকার্য	মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি	৭৭
১৩	আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে 'ফানা আনিল হাওয়া'র ভূমিকা	মুহাম্মদ জুলফিকার আলী চৌধুরী	৮৩
১৪	আত্ম অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারে, 'ফানা আনিল ইরাদা'র বাস্তব অনুশীলন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	৮৭
১৫	ইনসানে কামেল (পরিপূর্ণ মানুষের) সন্ধানে মাইজভাণ্ডারের 'গাউছিয়ত নীতি'র আলোকে মৌলিকভাবে ঐশী সংযোগেই মেলে যে অমূল্য রতন	ড. সেলিম জাহাঙ্গীর	৯৪

১৬	অর্থনৈতিক প্রবৃত্তি অর্জনের 'গাউছিয়ত নীতি'	ড. মো. গোলাম রব্বানী	১০৬
১৭	'ফানা আনিল এরাদা'র অনুশীলন মানবমনে স্রষ্টানুরাগ জাগ্রত করে এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভে ধন্য করে	কাজী মোহাম্মদ কামরুল আহছান	১১৪
১৮	নিরবদ্য জীবন গঠনে 'ফানায়ে ছালাছা'র ভূমিকা	মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান আলকাদেরী	১১৮
১৯	মাকাসিদে শরিয়াহ অনুধাবনে 'গাউছিয়ত নীতি'	ড. মুহাম্মদ কামাল উদ্দিন আল-আযহারী	১২৩
২০	ইসলামি ফিক্‌হের আলোকে 'গাউছিয়ত নীতি'	এ. বি. এম. আমিনুর রশীদ	১৩৭
২১	বর্তমান নৈতিক অধঃপতন থেকে পরিত্রাণ লাভে 'ফানা আনিল হাওয়া'র ভূমিকা	ড. মোহাম্মদ মতিউল ইসলাম	১৫৩
২২	নেপথ্য তত্ত্ব : ত্রিবিধ বিনাশ	হাফেজ মুহাম্মদ আনিসুজ্জমান	১৫৯
২৩	তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে ফানা আনিল হাওয়ার ভূমিকা	গোলাম মোস্তফা মোহাম্মদ নুরুন্নবী আল্-কাদেরী	১৬৬
২৪	'ফানা আনিল এরাদা'া তথা ইচ্ছার বিনাশ প্রসঙ্গ : কুপ্রবৃত্তির লয় ও সুপ্রবৃত্তির উদয়	মোহাম্মদ নুরুল আবছার	১৭২
২৫	স্বনির্ভর সমাজ গঠনে 'ফানা আনিল খাল্‌কে'র ভূমিকা	হাফেজ মুহাম্মদ ওসমান গণি	১৭৯
২৬	অহংকার দাম্ভিকতা পরিহারে 'ফানা আনিল হাওয়া'র ভূমিকা	কাজী আমিন উল্লাহ মহিউদ্দিন জেহাদী	১৮৪
২৭	ভোগবিলাস ও আত্মতৃপ্তি পরিহারে 'ফানা আনিল হাওয়া'র বিশেষ অবদান	মুহাম্মদ আলী আছগর	১৯৭
২৮	The Role of 'Gausiat Niti' in Eliminating Corruption	Sarwar Kamal	২০২
২৯	আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে 'ফানা আনিল হাওয়া'র চর্চা	মুহাম্মদ রেজাউল মোস্তফা তানভীর	২০৬
৩০	'ফানা আনিল এরাদা'র স্বরূপ ও তাৎপর্য	মুহাম্মদ মিশকাতুল ইসলাম	২০৯
৩১	ভিক্ষাবৃত্তি অপনোদনে 'ফানা আনিল খাল্ক' এর বাস্তব প্রয়োগ	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল মাসুম	২১৫
৩২	The Significance of Reducing Wastage of (time, food, and resources) Through *Fana Anil Hawa*	Rabiul Hossain Suborno Barua	২২২
৩৩	'ফানা আনিল হাওয়া' : কুপ্রবৃত্তির বর্জন ও খোদাতুষ্টি অর্জন	মুহাম্মদ আবুল হাছান	২২৮

৩৪	বিশ্ব মানবতায় 'গাউছিয়ত নীতি'র অবদান	মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন ছিদ্দিকী	২৩১
৩৫	প্রকৃত মু'মিনের পরিচায়ক 'গাউছিয়ত নীতি'	হাফেজ মুহাম্মদ আবু মুছা	২৩৬
৩৬	'নফ্স' নিয়ন্ত্রণে 'ফানা আনিল হাওয়া'র অনুশীলন : একটি পর্যালোচনা	মুহাম্মদ সালাহ উদ্দীন	২৪৪
৩৭	নৈতিক অবক্ষয় রোধে 'গাউছিয়ত নীতি'র প্রভাব	হাফেজ শফিউল আলম হোসাইনী	২৪৭
৩৮	حقيقة الفناء عن الإرادة وأهميته في الحياة	محمد قمرالحســـــن قادري	২৫৬
৩৯	লুটাই ললাট	মাহ্দী গালিব	২৬৪
৪০	টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে 'ফানা আনিল হাওয়া'র অনবদ্য ভূমিকা	উম্মুল ওয়ারা শাকেরা	২৭৪
৪১	কুরআন ও হাদিসের আলোকে 'ফানা আনিল খালক' এর গুরুত্ব	এরশাদ হোসেন (আসাদুজ্জামান)	২৭৯
৪২	*'অনর্থেরি পরিহারে তাক্ওয়ার ঝলক দেখেছি'* : 'ফানা আনিল হাওয়া'র আলোকে পর্যালোচনা	শেখ শাকিল মাহমুদ	২৮৬
৪৩	মটো	সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী	২৯৬

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِىَّ بَعْدَهٗ وَ عَلٰى اٰلِه وَ اَصْحَابِه وَ اَوْلِيَاءِ اُمَّتِه اَجْمَعِيْنَ

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং লাখ কোটি দরুদ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) উপর। শুকরিয়া আদায় করছি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর পাক চরণে। উনার দর্শনে যেন কোনো বিকৃতি স্থান না পায়, সেজন্য তাঁর সঠিক শিক্ষা ও জীবন-কর্ম প্রচারে বর্তমান সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দা জিল্লুহুল আলি) যে একান্ত প্রচেষ্টায় এবং সকলের সহযোগিতায় এই গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। এই গ্রন্থ সকল শ্রেণি-পেশার ও মত-পথের মানুষের কাছে এমন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে তা আমরাও ধারণা করতে পারি নি। সমস্ত পাঠকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং এই গ্রন্থের ব্যাপক চাহিদার কথা চিন্তা করে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে যাচ্ছি। এই সংস্করণে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি মুক্ত থাকার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়েছে। এই সংস্করণে এই গ্রন্থের ইলেকট্রনিক ভার্সন (ই-বুক)ও প্রকাশ হতে যাচ্ছে। এরপরও যদি কোন প্রকার মুদ্রণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে তাহলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিজ্ঞ পাঠকের প্রতি বিনীত আবেদন থাকল। পরিশেষে সকলের প্রতি ভালোবাসা ও শুভকামনা রইলো। আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন। আমিন।

ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ধন্যবাদান্তে-

শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট;
নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবার
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।
তারিখ : ৫ জুন ২০২৪ ইংরেজি, ২৭ জ্বিলক্বদ ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদকীয়

সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্যে যিনি নিজ অনুগ্রহে তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে কিছু বান্দাকে বেলায়তের মকাম দ্বারা স্বীয় বন্ধুত্বের মর্যাদা দান করেছেন। দরুদ ও সালাম খোদার প্রিয় হাবিব মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি, যাঁর জন্যে আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রবুবিয়্যত প্রকাশ করেছেন। তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি সালাম, যাঁদের মারিফাতের সুবাস গোটা বিশ্ববাসীকে মাতোয়ারা করে রেখেছে।

ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি। আত্মাকে সকল ব্যাধি থেকে পবিত্র কওে, ঈমানের গভীরতা, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি গভীর ভালোবাসা, সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে আখিরাতমুখি জীবন যাপন করাই মু'মিনের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের আদর্শ হিসেবে আল্লাহ তায়ালা যুগে যুগে নবি-রাসুল (আলাইহিমুস সালাম) গণকে নবুয়ত ও রেসালত দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মাধ্যমে নবুয়তের সমাপ্তি হলে; আল্লাহ তায়ালা হিদায়তের ধারা জারি রাখেন বেলায়তের মাধ্যমে। যাঁদের আদর্শের পূর্ণতম অনুসরণের মাধ্যমে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি ও বেলায়তের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে আসছে মানুষ। জড়বাদ ও ভোগবাদের করালগ্রাসে আক্রান্ত মানুষ আত্মার শূন্যতার পীড়নে ফিরে আসছেন ইমানের পথে। অপর দিকে, ইমানদারের জীবনেও আনছে পূর্ণতা। কারণ সুফিবাদ ইমানের গভীরতা, আমলের একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভালোবাসার আকুলতা সৃষ্টি করে। ধর্মীয় অনুশাসন পালনে আত্মিক প্রভাব পুরোপুরি লাভ করতে পারে।

মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ তায়ালা ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর ভালোবাসায় আকুল করতে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি দায়িত্ব পালনে সচেতন করতে কিছু কাজকর্ম ও নিয়ম-পদ্ধতি নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বহু

সুফিপথ বা তরিকা। তরিকার অনুসরণে মানুষের আত্মিক বিকাশকে সুমহান করে। খোদাভীতি অর্জনে সহায়ক হয়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি, প্রেম ও ভালোবাসা, বেলায়তের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সৃষ্টি ধন্য হয় মহান স্রষ্টার ভালোবাসার পরশে। সুফিপথের অন্যতম হলো মাইজভাণ্ডারী তরিকা।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮২৬-১৯০৬খ্রি.] মানুষের আত্মার মুক্তি এবং উন্নয়নের জন্যে সকল তরিকার নির্যাস নিয়ে কাদেরিয়া তরিকার সাথে সমন্বয় সাধন করে মাইজভাণ্ডারী তরিকার প্রবর্তন করেন। ধর্মের মর্ম ও কর্ম মেনে চলতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। তাঁর প্রবর্তিত তরিকার নীতি, আদর্শ, পদ্ধতি মানুষকে খোদাভীতির শিক্ষায় যেমন উজ্জীবিত করে, তেমনি মানব দরদি, শান্তিকামী ও সহমর্মী হয়ে উঠতে সদা অনুপ্রাণিত করে। ধর্মীয় গোড়ামী, ধর্মহীনতা, ধর্মীয় সহিংসতা ও উগ্রতার পথ থেকে মানুষকে শান্তির, কল্যাণের ও মুক্তির পথে আনতে মাইজভাণ্ডারী তরিকার 'উছুলে ছাবয়া বা সপ্তকর্ম পদ্ধতি' চূড়ান্ত সাফল্যের অনন্য উপায়। ইসলাম ধর্মের সাধন মার্গের অন্যতম অধ্যায় সুফিবাদের হিদায়তি মিশন মাইজভাণ্ডারী তরিকার উছুলে ছাবয়া আজ আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। মিশর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ইউসরি জবর রুশদি আল হাসানি *ফতহুল রহমান ফি শরহি মুতুনি আহলিল ফিকহি ওয়াল ইরফান* নামক গ্রন্থে ২৩১-২৪৪ পৃষ্ঠায় 'উছুলে ছাবয়া'র উৎস, মর্ম, গুরুত্ব বর্ণনা করেন। যা ২০২২ খ্রি. মিশর আল কাহেরা দারুল ওয়াবিলুস সা'য়িব থেকে প্রকাশিত হয়েছে। হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রদত্ত এবং অছিয়ে গাউছুল আজম খাদেমুল ফোক্‌রা হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) [১৮৯৩-১৯৮২খ্রি.] বর্ণিত উছুলে ছাবয়ার প্রথম তিনটি নীতি 'ফানায়ে ছালাছা' বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশই মাইজভাণ্ডারী তরিকার 'গাউছিয়ত নীতি' হিসেবে স্বীকৃত। গাউছিয়ত নীতিগুলো হলো যথাক্রমে ১. তেলাওয়াতে অজুদ (ফানা আনিল খাল্ক), ২. অনর্থ পরিহার (ফানা আনিল হাওয়া), ৩. সন্তোষ (ফানা আনিল এরাদা)। 'গাউছিয়ত নীতি'র নির্দেশনার আলোকে আমরা দেখি যে, মাইজভাণ্ডারী সুফি পথের পথিক হতে এ 'গাউছিয়ত নীতি'র অনুসরণ আবশ্যক হিসেবে গণ্য। গাউছিয়ত নীতির অনুকরণ-অনুসরণের পূর্ণতার উপরেই নির্ভর করে মাইজভাণ্ডারী

তরিকার অনুসরণের পূর্ণতা, এর ব্যতিক্রম হলে মাইজভাণ্ডারী তরিকতপন্থি তো নয়ই, বরং নীতিহীন হতে বাধ্য।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) বিশ্বত্রাণ কর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছিয়তের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ও মানবকল্যাণে তাঁর মহান আদর্শ ও নীতি আজ বিশ্বব্যাপী সমাদৃত। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর ওফাতের পূর্বে গাউছিয়তের সালতানাতের সুলতান হিসেবে অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কে তাঁর গদীর স্থলাভিষিক্ত একমাত্র সাজ্জাদানশিন হিসেবে খেলাফতের পবিত্র দায়িত্ব অর্পণপূর্বক তরিকা, সিলসিলা, উছুল, শজরা ও গাউছিয়ত নীতির আলোকে বিশ্বঅলির এ হিদায়াতি মিশন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব প্রদান করেন। আর অছিয়ে গাউছুল আজম (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) তাঁর ছেলেদের মধ্যে যোগ্যতম ব্যক্তি আবুল মোকাররম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি)[জন্ম ১৯৩৬] কে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর গদির স্থলাভিষিক্ত করে গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে একমাত্র সাজ্জাদানশিন মনোনীত করে হানাফি মাযহাব সুন্নতে ইজমা বিধি ফতোয়ামতে বায়াত প্রদান তথা পীর-মুরিদীর দায়িত্ব প্রদান করেন এবং গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত কেবলা (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর শিক্ষা দীক্ষা শজরাদান এবং ফতুহাত নিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্পন্ন, গাউছিয়ত জারি-সফলতা দানকারী সাব্যস্ত করেন।

স্বীয় পিতা ও মুর্শিদের খিলাফত অর্জনপূর্বক মুর্শিদ কেবলা সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর মহান আদর্শ ও নীতিকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিতে ও পথহারা মানুষকে হিদায়তের আলো বিতরণ করতে, বায়াত প্রদান, খানকা শরিফ প্রতিষ্ঠা, মাদ্‌রাসা, মক্তব, হেফজখানা, দায়রা, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটসহ অসংখ্য প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন।

ইসলাম ও তরিকতকে যুগোপযোগীভাবে গবেষণার মাধ্যমে মুসলিমজাতি ও বিশ্ববাসীর নিকট উপস্থাপন করতে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)'। একঝাঁক মেধাবী স্কলারের

অধীনে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI) ঐতিহাসিক 'মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফে'র একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান যা সুফিবাদ ও ইসলাম বিষয়ক বিদ্যায়তনিক গবেষণা, আন্তর্জাতিক ই-কনফারেন্স, সুফি সংলাপ ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম, জনসচেতনতামূলক লিফলেট প্রকাশ, সুফিবাদ বিষয়ক বই প্রকাশ, আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করে আসছে। প্রতি বৎসর স্মারক বক্তৃতা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ও এমফিল, পিএইচডি গবেষণাবৃত্তি প্রদানের লক্ষে গত ২০২১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। গত ২০২০ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে ৩টি আন্তর্জাতিক ই-কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ পর্যন্ত দুইটি ISSN নাম্বার সংবলিত রিসার্চ জার্নাল ও একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী তরিকা দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী পরিচিতি ও পরিধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এ বিশ্বতরিকার গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা দেখে ফিকিরবাজ, ফেরেববাজ লোক নিজেকে পীর, ফকির, দরবেশ বিভিন্ন নামে 'মাইজভাণ্ডারী' পরিচয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে ভন্ডামিতে লিপ্ত হয়েছে। যা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর নীতি আদর্শের পরিপন্থি।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর নীতি, আদর্শ, দর্শন ও তরিকায় প্রকৃতি যেন বিকৃতি না ঘটে সে লক্ষে সাজ্জাদানশিন আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) সদা সতর্ক ও সচেষ্ট আছেন। *উছুলে ছাবয়া* নামক স্মারকগ্রন্থটি প্রকাশের পর মূলত তাঁরই পরামর্শ, নির্দেশনা ও দোয়ার ফসল বর্তমান *গাউছিয়ত নীতি* নামক স্মারক গ্রন্থটি যাতে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ত্রিবিধ নীতির আলোকে ৩৯ জন বিদগ্ধ লেখক ও গবেষকের প্রত্যেকে পৃথক পৃথক শিরোনাম নির্ধারণ করে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করেছেন যা মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসরণ ও সুফিবাদ চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত যুগোপযোগী। তরিকতপন্থীরা যদি উক্ত বিষয়গুলোর উপর মনোযোগ ও আন্তরিকতার সাথে অধ্যয়ন করেন; তাহলে তিনি একজন সত্যিকারের খাঁটি তাসাউফপন্থী বান্দা হিসেবে পরিগণিত হতে পারবেন; এটি আমাদের একান্ত বিশ্বাস।

প্রকাশনা সৃজনশীল একটি শিল্প। এর জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন পর্যাপ্ত সময় ও জ্ঞান। সময়ের স্বল্পতা ও নানা সীমাবদ্ধতার কারণে এ

প্রকাশনায় বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। বিজ্ঞ পাঠক আপন মহিমায় তা মার্জনা করবেন। আপনাদের যথার্থ পরামর্শ ও সংশোধনী পরবর্তি সংস্করণে কাজে লাগাতে প্রয়াস পাবো।

পরিশেষে, আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ; আপনি আমাদের এ শ্রমটুকু কবুল করে নিন। এ গ্রন্থটি প্রণয়নে যারা লেখনীর মাধ্যমে, কম্পোজ, প্রুফ রিডিং ও বিভিন্নভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন; গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর ওছিলায় তাঁদেরকে উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করুন! আ-মি-ন ॥

ইতি

সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী

নায়েব সাজ্জাদানশীন ও মোন্তাজেমে দরবার
গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
ম্যানেজিং ট্রাস্টি, দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)

তারিখ :
১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি.
২১ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হি.

পৃষ্ঠপোষকের ভাষ্য

আলহামদুলিল্লাহ্ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল্লাহ্ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন।

মাইজভাণ্ডারী তরিকা সুফি সাধনার অন্যতম উপায়। এ তরিকার প্রতিষ্ঠাতা প্রাণপুরুষ গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) পথহারা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে বাংলার জমিনে এ মহান তরিকার প্রবর্তন করেন। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনের উপায় হিসেবে তরিকতের সবক ও আমল আদায়ের পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী তরিকায় দাখিল হতে হলে কিছু নিয়ম-নীতির অনুসরণ করা অপরিহার্য – যা মাইজভাণ্ডারী তরিকার 'গাউছিয়ত নীতি' হিসেবে স্বীকৃত। এ তরিকায় দাখিল ব্যক্তি গাউছিয়ত নীতি বিমুখ হলে মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারী দাবি করা চলে না।

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর তরিকা, আদর্শ, উছুল, শজরা, 'গাউছিয়ত নীতি' ও গাউছিয়ত সরকারের এই প্রকৃতি কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃতভাবে জারি রাখার মানসে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ওফাতের পূর্বে স্বীয় পৌত্র অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত শাহ্ সুফি মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কে তাঁর একমাত্র সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনি প্রায় ৭৭ বছর (১৯০৫-১৯৮২) পর্যন্ত গাউছিয়ত নীতির আলোকে দরবারে গাউছুল আজম ও গাউছিয়ত সরকারের দায়িত্ব পালন করেন। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর নীতি-আদর্শ তুলে ধরার কারণে তিনি মাইজভাণ্ডারী তরিকার স্বরূপ উন্মোচক অবিধায় অভিসিক্ত হন। আমার পিতা ও পীরে তরিকত অছিয়ে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) ১৯৭৪ সালে আমাকে একমাত্র সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে গদী শরীফের স্থলাভিষিক্ত করে এই গাউছিয়ত জারি সফলতা

দানকারীও সাব্যস্ত করেন। আমার উপর অর্পিত এ মহান দায়িত্ব পালনে আমার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে এবং থাকবে। যাতে তরিকায় নীতিহীনতার ছোঁয়া না লাগে, সেজন্য রয়েছে আমার সজাগ দৃষ্টি। আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর বাণী মতে, এ গাউছিয়ত সরকারের ধারাবাহিকতা শজরার মাধ্যমে মনোনীত সাজ্জাদানশীন এঁর ধারাবাহিকতায় আবহমানকাল জারি রাখার নিমিত্তে আমার একমাত্র পুত্র শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারীকে ১৩ অক্টোবর ২০১১ খ্রি. এ খেলাফত প্রদান করে একমাত্র বর্তমান নায়েব সাজ্জাদানশীন মনোনীত করে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর গাউছিয়ত কুতুবিয়তের মহিমা সমৃদ্ধ শরাফতের ধারা জারি রাখার কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। মাইজভাণ্ডারী তরিকার নীতি-আদর্শ ও গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর জীবন নিয়ে যুগোপযোগী গবেষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরতে 'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)' প্রতিষ্ঠা করে নায়েব সাজ্জাদানশীনকে ম্যানেজিং ট্রাস্টির দায়িত্বও প্রদান করেছি। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে প্রকাশিত *উছুলে ছাবয়া* নামক স্মারক গ্রন্থটি ইতোমধ্যে সাড়া যুগিয়েছে। *গাউছিয়ত নীতি* নামে এ প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করে মাইজভাণ্ডারী তরিকার নীতি আদর্শ বিশ্ববাসীকে অবগত করার মহান সুযোগ দানের জন্য আল্লাহ তায়ালার দরবারে অফুরন্ত শোকর আদায় করছি। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ কামনা করছি। আল্লাহ তায়ালা গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর উছিলায় সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন! আ-মি-ন।

সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম;
প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক
দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)।
তারিখ : ১ মাঘ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রি. ২১ জমাদিউস সানি ১৪৪৪ হি.

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

উছুলে ছাবয়া বা আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি

সাজ্জাদানশীনে গাউছুল আজম হযরত মওলানা শাহ্ সুফি
সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)

গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল
মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

ফানায়ে ছালাছা বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ স্তর ঃ-

(ক) "ফানা আনিল খাল্ক" - অর্থাৎ কাহারো নিকট কোনরূপ উপকারের আশা বা কামনা না থাকা; যাহার ফলে মানব মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজ শক্তি সামর্থের প্রতি আস্থা জন্মে।

(খ) "ফানা আনিল হা'ওয়া" - অর্থাৎ যাহা না হইলে চলে, সেইরূপ কাজকর্ম ও কথাবার্তা হইতে বিরত থাকা; যাহার ফলে জীবনযাত্রা সহজ ও ঝামিলা মুক্ত হয়।

(গ) "ফানা আনিল এরাদা" - অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাশক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজ ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলীন করা যাহার ফলে ছুফী মতে "তছলীম ও রজা" হাছিল হয়।

মউতে আরবা' বা চতুর্বিধ মৃত্যু ঃ

(ক) "মউতে আব্য়্যাজ"- অর্থাৎ সাদা মৃত্যু। ইহা উপবাস এবং সংযমে আয়ত্ব হয়; যাহার ফলে মানব মনে আলো ও উজ্জ্বলতা দেখা দেয়। যেমন, রমজানের রোজা বা নফল রোজা ইত্যাদি উপবাস ও সংযম পদ্ধতি। মহাত্মাগান্ধী কোন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইলে উপবাস করিতেন এবং বলিতেন "উপবাসে আমি আলো পাই।"

(খ) "মউতে আছওয়াদ"- বা কাল মৃত্যু। ইহা শত্রুর শত্রুতা ও নিন্দাতে হাছিল হয়। কারণ, অন্যের সমালোচনা বা নিন্দার পর মানব যখন নিজের মধ্যে উল্লেখিত সমালোচনা বা নিন্দার কারণ খুঁজিয়া পায় তখন নিজকে উক্ত দোষ হইতে সংশোধনের এবং অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ তায়ালার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার সুযোগ পায় এবং যদি অন্যের আরোপিত দোষ নিজের মধ্যে খুঁজিয়া না পায়, নিজকে দোষমুক্ত বলিয়া স্থির নিশ্চিত হয়, তখন আল্লাহ তায়ালার নিকট শোকরিয়া আদায়ের মনোবল প্রাপ্ত হইয়া নিজের ব্যক্তিত্বে বিরাট শক্তির সমাবেশ দেখিতে পায়। সমালোচনাকারীকে তখন "বন্ধু" বলিয়া মনে করে।

(গ) "মউতে আহ্মর"-বা লাল মৃত্যু। ইহা কামভাব ও লালসা হইতে মুক্তিতে হাছিল হয় এবং বেলায়ত প্রাপ্ত হইয়া অলিয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়।

(ঘ) "মউতে আখজার"-বা সবুজ মৃত্যু। নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইলেই ইহা হাছিল হয়। যাহার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম ভালবাসা ছাড়া অন্য কামনা-বাসনা থাকেনা। ইহা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

এই কোরআনী হেদায়তের সপ্ত পদ্ধতি, মানব জীবনের এক নিখুঁত সহজ, সরল ও স্বাভাবিক পন্থা; যাহা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে।

জনাব গৌতম বুদ্ধের অষ্টশীল নীতি হইতে ইহা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক। যেহেতু সৎ, অসৎ বস্তুর তুলাদণ্ড বিচার বর্তমানে কঠোর বেড়াজালে আবদ্ধ। কঠোর সাধনা বা এবাদত, বর্তমান অতি কামনার হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর যুগে সর্বসাধারণের নাগালের বাহিরে। এই সপ্ত পদ্ধতি, সংসার জীবনের বোঝা হালকা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দময় ও মধুর করে এবং পরের দুঃখ কষ্টের কারণ না হইয়া বরং বন্ধু সুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়।

এই সপ্ত পদ্ধতি, ইছলামী ছুফী মতবাদ মতে "ফানায়ে নফ্ছী" প্রবৃত্তির বিনাশ এবং "বাকাবিল্লাহ্‌র" বিভিন্ন উছুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামিলামুক্ত।

অন্যান্য বিশ্বধর্মীয় সাধনা সিদ্ধির নিয়মানুবর্তীর সঙ্গে বিরোধাত্মক নহে। বরং উৎসাহ বর্দ্ধক বাস্তববোধ জাগরণকারী, বিশ্ব সমস্যার সমাধানকারী মুক্তির দিশারী।

কর্মে ও মর্মে মানবতার উন্নয়নকারী। ইহা ব্যবসাদারী পীরত্বের সমর্থক নহে বরং নেহায়ত নিষ্কাম খোদা অনুরাগী। এই পীরী ব্যবসাদারী পতন যুগে, ইহা নৈতিক ধর্মের জীবন দানকারী ধ্রুবতারা।

যাহা ঐক্য ও সৃজনশক্তির শক্তিশালী আলো দানকারী। পবিত্র কোরানের পরিভাষায় যাহাকে (কাউকবে দুর্রী) کوکب دری বলা হইয়াছে।

খোদা অনুরাগী নীতিতে "নিছবতাইনে আ'দমী" বা বিগত আগত সফলতা পন্থার সমাবেশকারী বিধায়, "খাতেম" বা ছনদ্‌দাতা।

হজরত আক্‌দাছের এই সপ্ত পদ্ধতি বেলায়ত রহস্য; তাঁহার বিশ্ব ত্রাণকর্তৃত্ব সম্পন্ন গাউছিয়তের এক উজ্জ্বল নজীর। হাফেজ সিরাজী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) এঁর পরিভাষায় বলিতে হয়।

مژ گان تو تاتیغ جهانگیر بر آورد–بسکشته دل زنده که بر یکدیگر افتد

"তোমার চক্ষের পলক যখন বিশ্ববিজয়ী অসি বাহির করিল, তখন দিল ঘায়েল জিন্দা মানুষগুলি একের উপর অপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।"

মওলানা আবদুল হাদী রচিত রত্নভাণ্ডার ৩৬নং শে'এর ইহার উজ্জ্বল প্রমাণ ঘোষণা করে।

চলগো প্রেম সাধুগণ প্রেমেরি বাজার।
প্রেম হাট বসাইয়াছে মাইজভাণ্ডার মাজার ॥
সেথায় এক মহাজন নূরে আলম গাউছ ধন।
সাধুগণের প্রাণ হরিয়ে করেন বেপার ॥
প্রেম রতনের মুদ্রা দিয়ে টুটাফাটা দিল কিনিয়ে।
সেকান্দারী আয়না তাতে করেন তৈয়ার ॥

লেখা বিশ্বাসের পর্যায়ের বস্তু, ইহাতে মূলবস্তু দৃশ্যমান নহে। সেইজন্য নিজ গদি শরীফে হজরত কেবলা কা'বা আমাকে ঐ সময় কোরআন শরীফ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "দেখ দাদা ময়না! হরফ আছে কি?" তিনি এই রকম দুইবার দেখাইয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া দুইবার নিজেই মন্তব্য করিয়াছিলেন, "সমস্ত হরফ উড়িয়া গিয়াছে।" কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তাহাই সত্য। কোরআন পাকে যে লিখিত হেদায়ত বিদ্যমান আছে, সেইদিকে

খুব কম সংখ্যক লোকেরই সজাগ দৃষ্টি নিবদ্ধ।

পীরানে পীর দস্তগীর শাহে বাগদাদীর (রজিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বাণী ঃ

كلام حضرت پيران پير دستگير رضی الله عنه فی الفتح الربانی صفحه ٤٩ المجلس السادس

يا غلامی مرادی انت لا انا – وان تتغير انت لا انا

عبرت وانما وددتنی لاجلك – تعلق بی–حتی تعبر بالعجلة

"ওহে আমার পেয়ারা, তুমি যখন আমার প্রতি তাকাও বা আগ্রাহান্বিত হও; আগাইয়া আস। আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্খী। তোমার জন্য দোওয়া করি। আর যখন আগ্রহ বিমুখ হও পিছু ফির আমি তখনও পূর্ববৎ থাকি এবং তোমার জন্য কাঁদি। যেহেতু পিছন দিকে কিছু দেওয়া লওয়ার নিয়ম নাই।"

এইরূপ কল্যাণকামী বহু ছুফী সাধকের হিতবাণী ও নৈতিক গ্রন্থাবলী লিখিত বিদ্যমান আছে; যাহার প্রতি জনগণ বিমুখ হওয়ার ফলে ইহার উপকার হইতে বঞ্চিত।

হজরত কেবলা কা'বা খাতেমুল অলী ও অলদ্। তিনি বিশ্ববাসীর জন্য খোদার বিশেষ দান "ফয়জে মোজাররদ।" পুকুরের মত কাহারো দ্বারে তিনি যাননা কিংবা কাহারো মুখাপেক্ষীও তিনি নহেন। সকলই তাঁহার দ্বারস্থ। তৃষ্ণাতুর ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকামী জনগণ প্রত্যেকে প্রত্যেকের যোগ্যতার ভাণ্ড লইয়া তাঁহার নিকট আসিতে হয় এবং পাত্র অনুযায়ী তাঁহার দান নিয়া যায়।

এই বেলায়ত রহস্য ব্যক্ত করিতে আমি অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তি, যেহেতু আমি অলীয়ে কামেলের "অছী।" তিনি ওফাত হইবার কয়েক দিন পূর্বে আমাকে তাঁহার গদী শরীফের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। যেমন হজরত আলী (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ) এঁর বাণী ঃ-

ديوان علی رضی الله تعالٰی عنه

وهذا العلم لم يعلمه الا – نبی او وصی الانبياء

"এই জ্ঞান এমন এক জ্ঞান, যাহা নবী অথবা নবীর অছী ছাড়া অন্য কেহ জানিতে পারেনা।"

দিওয়ানে আলী (কাদ্দাসা সির্‌রাহুল আজিজ)

যাহা রূহানী প্রেরণা সম্ভূত "মলকুত এলহাম" বা এলহামী ফেরেস্তার কাজ কারবারের পর্যায়ভুক্ত। সুফি পরিভাষায় যাহাকে এলমে লদুন্নী বলা হয়।

* বেলায়তে মোত্‌লাকা, প্রকাশকাল : (২৫ মে ২০১৪ খ্রীঃ, পৃঃ ৭০-৭৩)

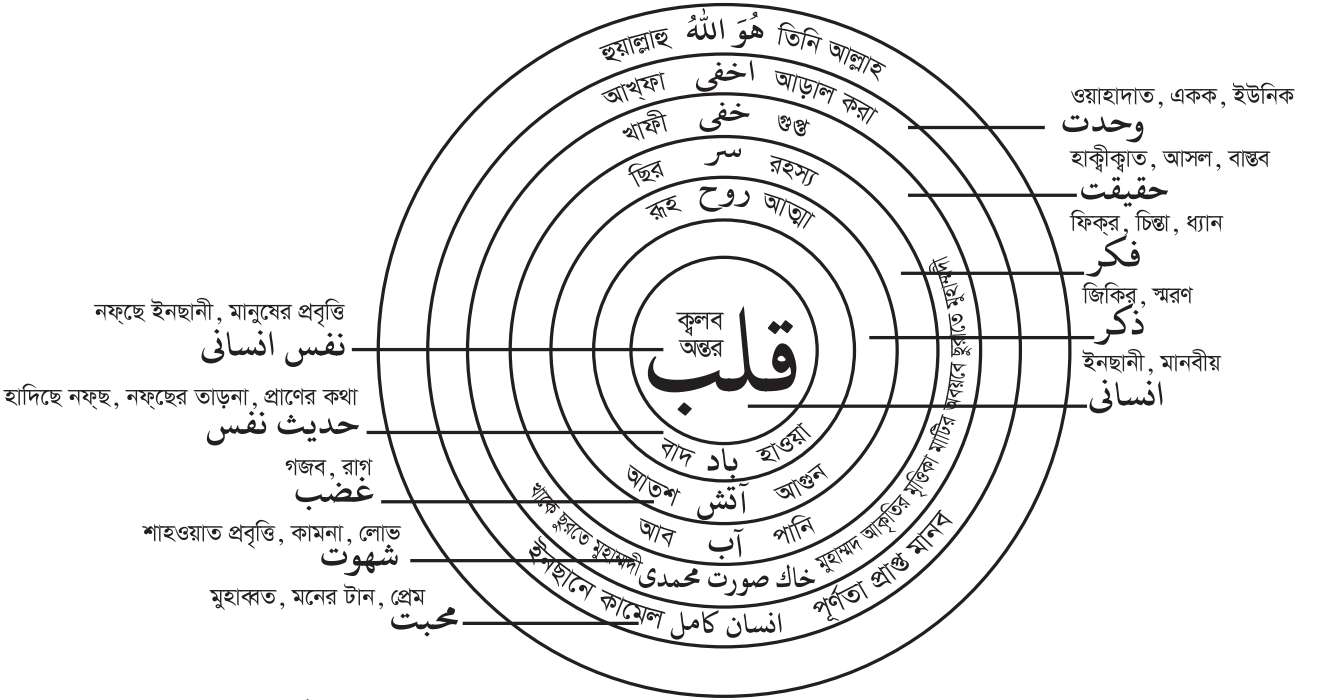

فما انت هو بل انت هو وتراه فى ☆ عين الامـور مسرحا ومقيـدًا

"ফামা আন্তাহুয়া বাল্ আন্তাহুয়া ওয়া তারাহুফী। আইনিল ওমুরি মুছ্‌রিহান ওয়া মুকায়্যিদান॥"

অর্থঃ তুমি সে নও বরং সে তুমি এবং তাকে তুমি দেখতে পাবে প্রত্যেক সৃষ্টির উৎসমূলে ব্যাপক ও সীমাবদ্ধভাবে।

২নং নক্‌শা-

		১	২	৩	٤	٥	٦	٧
১।	নফ্‌ছের নাম	امّارة	لوّامه	ملهمه	مطمئنه	راضية	مرضية	كاملة
২।	কর্ম্ম	প্ররোচনা	অনুতাপ	স্রষ্টাপ্রেরণা	সন্তোষ	সন্তুষ্টি	তুষ্টিত	পূর্ণমানবতা
৩।	অবস্থান ক্ষেত্র	দৃশ্য জগত عالم شهادت	মধ্য জগত عالم برزخ	বাচ্চার দুগ্ধ স্পৃহা اهلاج	মানবতা حقيقت محمدى صلي الله عليه وسلم	رضا وتسليم তুষ্টি لاهوت বা অসীম দর্শন	যথাযথ স্রষ্টা জ্ঞান شهود ذاتى	বহুত্বে একত্ব خفاء দর্শন পূর্ণমানবতা انسان كامل বা
৪।	প্রকৃতি বা হাল	বাসনা ميل	ভালবাসা محبت	বাসনা শূন্য প্রেম عشق	মিলন বা وصلة	غناء বেপরওয়া ও নিশ্চিত	الحيرة বিভোর চিত্ত	بقاء بالله سير مع الله খোদা সঙ্গতি
৫।	অবতীর্ণ ধর্ম্ম	شريعت বা বিধান ধর্ম্ম	طريقت বা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম	নিজ পরিচয় معرفت	প্রকৃত জ্ঞান বা حقيقت	খোদা তত্ত্ব জ্ঞান বা عرفان معرفت	شريعت ধর্ম্ম রহস্য مشيت ايزدى	উপরে বর্ণিত সমস্ত কিছু

মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, ৮ম প্রকাশ ১৫ মে ২০১৮ ইংরেজী, পৃঃ ৩-4

গাউছিয়ত নীতি

১। **তেলাওয়াতে অজুদ :** নির্জন সময়ে নিজের গত দিনের ভালমন্দ কাজ-কর্মের বিচার, চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে মন্দের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা, ভালোর জন্য নিজ পীরের আনুগত্য এবং খোদার সাহায্য কামনা, মোনাজাত, বিনয়ে প্রার্থনা-অনিবার্য। ফলে খোদা পথচারী নাছুত্ভাব কামনার ঊর্ধ্বে 'লাওয়ামা' 'মলকুত্' শক্তি জগতে উত্থিত হইতে সক্ষম হয়। যাহাকে ছুফি পরিভাষায় 'ফানা আনিল খাল্ক' বলে।

২। **অনর্থ পরিহার :** যাহা না হইলে চলে ও উপকার বিহীন, এহেন কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, বাক্বিতণ্ডা ত্যাগ, পরিহার, এড়াইয়া চলা এবং পরের দোষ তালাস না করা, পরমুখাপেক্ষীতা ও পরশ্রীকাতরতা বিমুখ হইয়া, নিজ শক্তি সামর্থে হালাল রুজির প্রতি আস্থাশীল হওয়া। অপচয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার যথাঃ পান, বিড়ি-সিগারেট, অলঙ্কার, অঙ্গ বিকৃতকারী পোষাক পরিচ্ছদ, পবিত্র কোরান যাহাকে 'মর্হান' অহঙ্কারী 'ফাখুরাণ' গর্বকারী বলে নির্দেশ করেছে, যাহা মানবের দৈহিক, নৈতিক অবনতি ঘটায়, কর্ম বিমুখতা, অভাব অনটন, আর্থিক দুর্গতি আনায়ন করে। ভূষণ, ফ্যাসন, মোহের ফলে আদি অসভ্যতা 'পছন্দ' হইয়া পড়ে। সুতরাং এ সমস্ত পরিহারের ফলে খোদা পথচারী 'ছালেক' কোরানের বাণী "ওয়ানাহান্ নাফ্ছা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া" মতে নিশ্চিত স্বর্গবাসী, ইহাকে ছুফি পরিভাষায় বলে 'ফানা আনিল হাওয়া।'

৩। **সন্তোষ :** খোদার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ সংসার স্বার্থ বুদ্ধিকে নত করিয়া মঙ্গলদায়ক রূপের ধ্যানে 'ছবর' ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা। যেহেতু স্রষ্টা সৃষ্টির রক্ষক, পালক, বর্দ্ধক, মঙ্গলদায়ক। ছুফি পরিভাষায় এই গুনজ প্রকৃতিকে বলে 'তছলিম' বা 'রজা।'

এই ত্রিবিধ নীতিমালাই 'ফানায়ে ছালাছা' বা বিনাশ পদ্ধতি। যাহা হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী কেব্লার সপ্ত পদ্ধতির অন্তর্গত।

প্রথম অংশ, 'এবাদতে মোত্নাফিয়া' হিসাবে 'ছালেক' খোদা পথচারীর জন্য অপরিহার্য।

উপরোক্ত গাউছিয়ত নীতিহীন, বিমুখ ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারী দাবী করা চলে না।

[বিঃ দ্রঃ 'বেলায়তে মোত্লাকার' দ্বাদশ পরিচ্ছদে হযরতের বাণী এবং অষ্টম পরিচ্ছদে বেলায়েত রহস্য অধ্যায়।]

বিনীত-

খাদেমুল ফোক্রা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী
সাজ্জাদানশীন, গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার শরীফ
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নয়নে 'গাউছিয়ত নীতি'র ভূমিকা

✍ সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী

নফ্সের পরিশুদ্ধি দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নফ্সের পরিশুদ্ধি ছাড়া মানুষের ঈমান ও ইসলাম কখনও বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণ হয় না। মানুষের বাহ্যিক ও আত্মিক দুইটি দিক আছে। ইসলাম যেমন মানুষের বাহ্যিক তথা বাহিরের দিককে সুন্দর ও পরিপাটি করতে চায় তেমনি অভ্যন্তরীণ বা আত্মিক দিককেও করতে চায় সুন্দর ও সম্পূর্ণ কলুষমুক্ত। মানুষের অভ্যন্তরীণ তথা আত্মিক দিকের পরিশুদ্ধিকেই কুরআনের ভাষায় বলা হয় তাযকিয়াতুন নফ্স তথা আত্মশুদ্ধি।

আত্মা বা নফ্সের পরিশুদ্ধি কত বেশি প্রয়োজন তা একটা উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বোঝার চেষ্টা করতে পারি; যেমন : যদি কেউ বাহ্যিকভাবে প্রচলিত নিয়মে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি পালন করে থাকে কিন্তু তার নফ্স বা আত্মা পবিত্র ও পরিশুদ্ধ না হয়; তবে তার সে আমল হবে ওই ফুলের মতো, যার রং সুন্দর এবং দেখতে আকর্ষনীয় কিন্তু তার কোনো সুঘ্রাণ নেই। এগুলো হয়ে যাবে নিষ্প্রাণ ইবাদত। এ ধরনের ইবাদত মহান মওলা-র দরবারে কবুল হওয়ার যোগ্য নয়।

ইসলামের আলোকে যদি কোনো ব্যক্তিকে পরিমাপ করতে হয় তবে দেখতে হবে তার আত্মা তথা নফ্স কতখানি পূতপবিত্র এবং কুলুষমুক্ত। কেননা মহান আল্লাহ্ বান্দার অন্তরকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকেন; তার বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানকে নয়। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে : সরকারে দু'আলম রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন : নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও সৌন্দর্য দেখেন না বরং তোমাদের অন্তরের নিয়ত তথা ইবাদতে ইখলাস ও আন্তরিকতাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন।

মনে রাখতে হবে, একজন মানুষ তার নফ্সকে পবিত্রকরণ ও মনের কলুষ দূরীকরণের মাধ্যমে নিজের আবেগ অনুভূতিকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এমনভাবে নিয়োজিত করতে পারে যে, দ্বীনের বাহ্যিক ইবাদত-বন্দেগি তার আত্মা ও নফ্সের দাবিতে রূপায়িত হয়ে যাবে।

কাজেই আত্মা বা নফ্স পরিশুদ্ধ করা এবং এ উদ্দেশ্যে তার ওপর সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ ও শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা দ্বীনের অতি অপরিহার্য একটি কর্তব্য এবং সবচেয়ে বড়ো জিহাদ।

দেহের যেমন রয়েছে দুটি অবস্থা সুস্থতা ও অসুস্থতা। ঠিক তেমনি আত্মারও রয়েছে সুস্থতা ও অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে যেমন চিকিৎসার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলতে হয়, তেমনি আত্মা রোগাক্রান্ত হলে তাকে অলিয়ে কামিলের সোহবতে সুস্থ বা পরিশুদ্ধ করে তুলতে হয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন :

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝٩
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝١٠

অর্থাৎ 'আর শপথ নফ্সের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন। এরপর তাকে অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। অবশ্যই সেই সফলকাম হবে যে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করবে। আর অবশ্যই সেই ব্যর্থ মনোরথ হবে যে নিজের আত্মাকে কলুষিত করবে।' (সূরা আশ-শামস : আয়াত : ৭-১০)

এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য প্রথমে জ্ঞানের প্রয়োজন আর মানুষকে দুই রকম জ্ঞান দেওয়া হয়েছে : এক. অসৎকর্মের জ্ঞান, দুই. সৎকর্মের জ্ঞান। আয়াতের আলোকে পরিশুদ্ধির বিষয়টি দুইভাবে চিন্তা করা যায় :

১. মন্দ দিক : যা আখলাকে সায়্যিয়াহ বা মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য যাবতীয় পাপ, অন্যায় ও অপবিত্র কাজ থেকে মুক্ত হওয়া অর্থাৎ যাবতীয় অসৎ গুণাবলি বর্জন করা; যেমন : শিরক, রিয়া, অহংকার, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, ঘৃণা, কৃপণতা, ক্রোধ, গিবত, পরনিন্দা, চোগলখুরি, কুধারণা, দুনিয়ার প্রতি মোহ, আখিরাতের উপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া, জীবনের প্রতি অসচেতনতা, অর্থহীন কাজ করা, অনধিকার চর্চা প্রভৃতি হতে নিজেকে এবং দেহ ও আত্মাকে মুক্ত রাখা। আত্মা মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রুতে পরিণত হয় যখন সে তাকে পাপাচার ও সীমালঙ্ঘনের দিকে আহ্বান করে। কেননা এই অপরিশুদ্ধ, পাপাচারী, ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর মানুষকে আল্লাহ্র স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামকে এই মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে,

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۝١٧ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۝١٨ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ

فَتَخْشٰى ﴿١٩﴾

অর্থাৎ 'তুমি ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালঙ্গন করেছে'। এরপর তাকে বলে 'তোমার কি ইচ্ছা আছে যে, তুমি পবিত্র হবে?' 'আর আমি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?' (সূরা আন নাযিআত, আয়াত : ১৭-১৯)

২. ভালো দিক : যা আখলাকে হাসানা বা সচ্চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উত্তম গুণাবলী দ্বারা আত্মার উন্নতি সাধন করা। প্রশংসনীয় গুণাবলি অর্জনের মাধ্যমে পরিত্যাগকৃত অসৎ গুণাবলির শূন্যস্থান পূরণ করা। সৎ গুণাবলি হল তাওহিদ, ইখলাস, ধৈর্যশীলতা, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা, ধৈর্যধারণ, তওবা, শুকর বা কৃতজ্ঞতা, আল্লাহভীতি, আশাবাদিতা, লজ্জাশীলতা, বিনয়-নম্রতা, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ প্রদর্শন, পরস্পরকে শ্রদ্ধা-সম্মান ও স্নেহ, মানুষের প্রতি দয়া-ভালোবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন, ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ, পরোপকার প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বোত্তম চরিত্র অর্জন করা। হাদিসে পাকে এসেছে :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলা হলো :

أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ صَدُوقِ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ؟ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَغْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ- سنن ابن ماجه - (١٢ / ٢٦١)

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, 'প্রত্যেক বিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী সত্যভাষী ব্যক্তি। তারা বলেন, সত্যভাষীকে তো আমরা চিনি, কিন্তু বিশুদ্ধ অন্তরের ব্যক্তি কে? তিনি বলেন : সে হলো পূতঃপবিত্র, নিষ্কলুষ চরিত্রের মানুষ, যার নাই কোন পাপাচার এবং নাই কোন দুশমনি, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মহমিকা ও কপটতা। (ইবনে মাজাহ)

হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য সর্বদা দোয়া করতেন। হাদিসে পাকে এসেছে :

হযরত যায়িদ ইবনে আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, আমি কি তোমাদের কাছে তেমনই বলবো যেমন হযরত রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا- صحيح مسلم - (١٣ / ٢٥١)

অর্থাৎ 'হে আল্লাহ্ ; আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য এবং কবরের আজাব থেকে। হে আল্লাহ্, তুমি আমার নফ্সে (অন্তরে) তাকওয়া দান কর এবং একে পরিশুদ্ধ করে দাও। তুমি সর্বোত্তম পরিশোধনকারী, তুমি প্রকৃত মালিক ও আশ্রয়স্থল। হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অনুপোকারী ইলম থেকে ও ভয়-ভীতিহীন কলব থেকে; অতৃপ্ত নফ্সের অনিষ্ট থেকে ও এমন দোয়া থেকে যা কবুল হয় না।' (মুসলিম শরিফ)

অন্তর যদি পবিত্র ও পরিশুদ্ধ হয়, তা হলে মানবদেহের বাহ্যিক কার্যক্রম ও পরিচ্ছন্ন, নির্মল ও কল্যাণকর হয়। আর যদি অন্তর অপবিত্র ও কলুষিত থাকে, তা হলে মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণসহ তার কার্যাবলিতে অপরিচ্ছন্নতা ও অকল্যাণের কালো ছায়া পাওয়া যায়। নফ্স পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে একজন ব্যক্তির ঈমান, আমল ও আখলাক পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿١٧﴾

অর্থাৎ 'নিশ্চয়ই সে সাফল্য লাভ করবে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, এরপর নামায আদায় করবে; বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও; অথচ পরকালের জীবন সর্বোত্তম ও স্থায়ী।' (সূরা আল-আলা, আয়াত : ১৪-১৭)

নিজেকে পরিশুদ্ধির তিনটি দিক এ আয়াতে ওঠে এসেছে, তাহলো– এক. আল্লাহকে অধিক স্মরণ (যিকির) করা; দুই. নামায আদায় করা; তিন. পরকালকে প্রাধান্য দেওয়া এবং দুনিয়ার জীবনকে তুচ্ছ মনে করা। অন্য আয়াতে জানা যায়, দেহ ও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য প্রথমে মুমিন হতে হবে। বিষয়টি মহান আল্লাহ্ এভাবে ঘোষণা করেন :

وَ مَنْ يَّأْتِهٖ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصّٰلِحٰتِ فَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الدَّرَجٰتُ الْعُلٰى ۝ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا مَنْ تَزَكّٰى ۝

অর্থাৎ 'আর যারা তাঁর কাছে আসবে মুমিন অবস্থায়, অবশ্যই সৎকর্ম করে তাদের জন্যই রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। স্থায়ী জান্নাত; যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, তারা সেখানে স্থায়ী হবে আর এটা হলো তাদের পুরস্কার যাঁদের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়েছে।' (সূরা ত্বহা, আয়াত : ৭৫-৭৬)

এ আয়াতেও মহান আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে পরিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রথমেই আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ ঈমান আনার কথা বলেছেন, তারপর অবশ্যই সৎকর্ম করতে হবে বলে উল্লেখ করেছেন; তবেই তাদের জন্য উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী জান্নাত সুনিশ্চিত।

আয়াতের আলোকে আরও বোঝা যায়, ঈমান বিষয়টি অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। আর মানবদেহ পরিচালিত হয় তার কলব বা অন্তরের মাধ্যমে। এ কারণেই হাদিসে পাকে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন :

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ- صحيح مسلم - (٨ / ٢٩٠)

অর্থাৎ 'জেনে রাখো! দেহের মধ্যে এক টুকরা গোশত আছে। যখন তা সুস্থ থাকে তখন পুরো শরীরই সুস্থ থাকে। আর যখন তা নষ্ট হয়ে যায় তখন পুরো শরীরই নষ্ট হয়ে যায়। স্মরণ রেখো! তা হলো কলব বা অন্তর।' (সহিহ মুসলিম)

সুতরাং ইহ ও পরকালীন সাফল্য ও কামিয়াবি চারিত্রিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধনে 'গাউছিয়ত নীতি' তথা 'ফানায়ে ছালাছা' বা রিপুর ত্রিবিধ বিনাশের ভূমিকা অপরিসীম।

আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে অন্তর ও আত্মাকে পরিশুদ্ধির তৌফিক দান করুন। দুনিয়া ও পরকালের সফলতা অর্জনের তৌফিক দান করুন। আ-মি-ন।

وصلّى الله وسلّمُ عَلى خير خلقهِ ونور عَرشهِ مَولَانا محمد والـهِ وصحبهِ واولياءِ امتهِ وعلينا معهُم اَجمعين.

লেখক : প্রাক্তন অধ্যক্ষ
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে 'ফানায়ে ছালাছা'র অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য

✍ কাজী মোহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী

মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব একটি সর্বজন স্বীকৃত বিষয়। মানবীয় গুণ থাক বা না থাক, প্রত্যেক মানুষ কিন্তু মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ব অকপটে স্বীকার করে, যার ফলে মানুষকে "সৃষ্টির সেরা জীব" হিসেবে মর্যাদা দান করা হয়েছে। প্রত্যেকে এ শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হলেও এর অর্জনের ক্ষেত্রে অধিকাংশই উদাসীন। ফলতঃ মানব সমাজের সব অশান্তির মূল কারণ নিজেদেরই গড়া। তাই পবিত্র কুরআনে মানবজাতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ ۚ

অর্থাৎ 'আমি নিশ্চয়ই আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।' (সুরা বনি ইসরাঈল-৭০) প্রশ্ন হলো সম্মানিত হওয়ার পেছনে নিশ্চয়ই কার্যকর কোনো বিষয় নিহিত। আর তা হলো দুটি বিষয় : এক. ঈমান, দুই. নেকআমল বা পূণ্য কাজ। অর্থাৎ মানবজাতি সম্মানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হলে এ দুটি বিষয় অবশ্যই তার মধ্যে থাকতে হবে। তাই পবিত্র কুরআন স্পষ্টভাবে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার মানদণ্ড ঘোষণা করেছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় যাঁরা ঈমান এনেছে এবং পুণ্য কাজ করেছে তারাই সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ'। (সুরা বাইয়িনাহ-৭) আর তার বিপরীতে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ

اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ؕ

অর্থাৎ 'নিশ্চয় আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি-নাসারা ও মুশরিকদের থেকে যারা কুফরি করেছে, তারা জাহান্নামে স্থায়ীভাবে পতিত হবে। তারাই সৃষ্টির সবচেয়ে খারাপ ও নিকৃষ্ট। (সূরা বাইয়িনাহ-৬)

আর ঈমানদার পুণ্যবানদের বেলায় ইরশাদ হয়েছে :

جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهٗ ۚ﴿۸﴾

অর্থাৎ 'ঈমানদার পুণ্যবানদের তাদের রবের নিকট বিনিময় হলো আদন বেহেশত যার নীচে ঝরনাসমূহ প্রবাহিত। তারা জান্নাতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তাদের উপর সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট। এ মর্যাদা ঐ প্রত্যেক ঈমানদারের জন্য যে তার রবকে ভয় করেছে' (সুরা বাইয়িনাহ-৮)।

পবিত্র কুরআনের "সূরা বাইয়িনাহ" এর আয়াত সমূহ দ্বারা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত যে পরকালীন চূড়ান্ত মুক্তি ও শান্তি তাদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং পুণ্য কাজ করেছে। অপরদিকে, আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি-নাসারাগণ আল্লাহ্র প্রেরিত নবি-রাসুলের উম্মত ও আসমানী কিতাব যথাক্রমে তৌরাত ও ইঞ্জিলের অনুসারী হয়েও প্রিয়নবি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যদি ঈমান না আনে, তারাও স্থায়ীভাবে জাহান্নামে অবস্থান করবে। আর মুশরিকদের অবস্থাও তা-ই হবে। পবিত্র কুরআনের এ স্পষ্ট ঘোষণার বিপরীত কোন বিষয় কোনো ঈমানদার চিন্তাই করতে পারে না।

মহান আল্লাহ্র একমাত্র মনোনীত দ্বীন-ইসলামের সঠিক আকিদা আদর্শের উপর অটল-অবিচল থাকতে হলে আল্লাহ্ তায়ালার অনুগ্রহপ্রাপ্ত অলি-বুযর্গদের নির্দেশিত পথে চলা মুক্তির সনদ। শরিয়তের মহান ইমামগণ ইসলামি শরিয়তের অনুমোদিত উপায়ে নানা পদ্ধতি উদ্ভাবন করে ঈমানদার মুসলমানদের উভয় জগতের সাফলের পথ উন্মুক্ত করেছেন।

উপরি-উক্ত 'ফানা-এ-ছালাছা'ও তার অন্যতম। যার আংশিক বর্ণনা নিম্নরূপ :

প্রথম ফানা : "ফানা আনিল খালক" এ খালক্ব বলতে আল্লাহ্ তায়ালার মহান সত্তা ছাড়া আর যা কিছু আছে সবই খালকের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, বান্দা সব বিষয়ে মহান আল্লাহ্ তায়ালার মুখাপেক্ষী থাকবে সর্বদা। আল্লাহ্

ছাড়া অন্য কারও নিকট কোনো আশা করবে না; কারণ, ভালো-মন্দ সব কিছু মহান আল্লাহ্‌র কুদরাতের হাতে। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ﴿١٥﴾

অর্থাৎ 'হে মানবজাতি! তোমরা সবায় আল্লাহ্ তায়ালার মুখাপেক্ষী। আর আল্লাহই হলেন গণি বা অমুখাপেক্ষী ও তিনি প্রশংসিত। (সূরা ফাতির-১৫)

হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কে ইরশাদ করেন সব উম্মত যদি একত্রিত হয় যে, তোমার কোনো উপকার করবে কোনো বিষয়ে। তারা ঐ বিষয়েই পারবে যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। (অনুরূপ) তারা সবাই যদি একত্রিত হয়ে তোমার কোনো বিষয়ে ক্ষতি করতে চায় তারা পারবে না। হ্যাঁ- অতটুকু পারবে- যা তোমার জন্য নির্ধারিত আছে। কারণ, এসব বিষয় লাওহে মাহফুযে কলম লিখে ফেলেছে আর লেখাও শুকিয়ে গেছে দফতরে। (সুনানুত্ তিরমিযী)

উক্ত হাদিস শরিফে আরও বর্ণিত হয়েছে- হুযুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) কে বলেন- যখন তুমি কিছু চাইবে, আল্লাহর নিকট চাও। আর যখন সাহায্য চাইবে- আল্লাহ্‌র নিকট চাও। (সুনানুত্ তিরমিযী)

এরই আলোকে আরেফ রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) ইরশাদ করেন :

فانتبه ثم اعتبر ثم انتصب- واستعن بالله ثم اجهد تصب

অর্থাৎ হে বান্দা, তুমি সতর্ক ও সচেতন হও; অতঃপর উপদেশ গ্রহণ কর, তৎপর প্রস্তুত হও। আর আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো, তার প্রচেষ্টা চালাও, তবে তুমি মনযিলে মকছুদে পৌঁছতে পারবে। (মছনবি শরিফ- শে'র নং-৮৬৭ খাযায়েনুল উলুম শরহে মসনবি-১, মওলানা রুমি-পৃ. ৩৬১)

উল্লেখ্য যে, এসব বর্ণনার উদ্দেশ্য এ নয় যে, বান্দা নবি-অলির দ্বারস্থ হতে পারবে না; কারণ, তাঁরা হলেন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চিত অছিলা বা মাধ্যম।

দ্বিতীয় ফানা : "ফানা আনিল হাওয়া" অর্থাৎ নফ্‌সের প্ররোচনার অনুসরণ থেকে সাধ্যমতো বিরত থাকা। মন যা চায়, তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ মানুষের মনে খারাপের প্রতি আগ্রহ আসে নফ্‌সের পক্ষ থেকে। এ

ধরনের ইচ্ছে ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করা। তখনই বান্দা মহান আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের যোগ্য হয়।

মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন :

اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿۴۰﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿۴۱﴾

অর্থাৎ 'যে ঈমানদার মহান আল্লাহ্‌র নিকট জবাবদিহিতার জন্য দাঁড়ানোকে ভয় করবে। আর নফ্‌সের অনুসরণ থেকে বিরত থাকবে। তার ঠিকানা হবে জান্নাত।' (সূরা আন নাযিয়াত, ৪০-৪১)

এ ক্ষেত্রে সাফল্যের চাবিকাঠি হলো নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আকীদা-আদর্শ ও নির্দেশনা মেনে চলা সর্বত্র। তাই তিনি ইরশাদ করেন : "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"

(شرح السنة - البغوي- ١ / ٢١٣)

অর্থাৎ 'তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না– যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনিত আদর্শের যথার্থ অনুসারী হবে।'

কিতাবুসসুন্নাহ-ইমাম ইবনে আমি আছেম (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এরই আলোকে আল্লামা রুমী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

عروۃالوثقی است این ترک ہوا ــ برکشد ایں شاخ جاں را برسما

অর্থাৎ 'নফ্‌সে আম্মারার অনুসরণ বর্জন করা আল্লাহ্‌র পথে সফল হবার মজবুত রশি। এটি মানবাত্মাকে উপরের দিকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নৈকট্যে নিয়ে যায়। (মসনবি শরিফ : শে'র নং-৭৮১)

তৃতীয় ফানা : "ফানা আনিল এরাদা" অর্থাৎ নিজের ইচ্ছেশক্তিকে মহান আল্লাহ্ ও প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইচ্ছের মধ্যে ফানা করে দেওয়া। অনুরূপ কামিল পীর-মুর্শিদের নির্দেশনার সামনে নিজ ইচ্ছেকে ফানা করে নিজের মধ্যে তাঁর ইচ্ছের প্রতিফলন ঘটাতে পারলেই তরিকতের পথে সাফল্য নিশ্চিত। এ জন্য প্রকৃত মুরিদের এর সংজ্ঞা এভাবেই দেওয়া হয়েছে :

المريدون يغنى ارادته الشيخ

অর্থাৎ মুরিদ ঐ ব্যক্তি যিনি আপন শায়খ বা পীরের ইচ্ছের মধ্যে নিজের ইচ্ছেশক্তিকে ফানা করে দেয়। এ ক্ষেত্রে পীরে কামিল না হলে হিতে বিপরীত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থেকে যায়। তখন পীরের কোনো নির্দেশ বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রশ্নবিদ্ধ মনে হলেও তার পেছনে একটি সঠিক সমাধান নিহিত থাকে। যেমন : এক মুরিদের এর প্রিয়তমা স্ত্রীকে গুন্ডারা লুট করে নিয়ে যায়। তখন ঐ মুরিদের ঘর-সংসারে বড় ধরণের বিপর্যয় নেমে আসে। সে তার পীরের নিকট এ সমস্যা থেকে উত্তারণের পথ কামনা করে। তখন পীর সাহেব তাকে ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলার পরামর্শ দেন। এভাবে চলতে থাকে। এদিকে স্ত্রীকে না পেয়ে মুরিদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ছে। এমতাবস্থায় পীর তাকে পতিতালয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন।

এতটুকুতেই প্রত্যেকের নিকট বিষয়টি অত্যন্ত আপত্তিকর মনে হবে। একজন পীর হয়ে কীভাবে এ ধরনের আপত্তিকর নির্দেশনা দিতে পারেন। বড়ো জোর তিনি মুরিদকে আরেকটি বিয়ে করার নির্দেশ দিতে পারতেন যা সম্পূর্ণ শরিয়ত সম্মত। এটা আমাদের সাধারণে দৃষ্টিভঙ্গি। আর অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন কামিল পীর আমাদের চেয়ে আরও অনেক দূর দেখেন– এ বিশ্বাস মুরিদের থাকতে হবে। যাই হোক মুরিদ স্বীয় পীরের নির্দেশনা মাথাপেতে নিয়ে পতিতালয়ে গমন করল। ওখানকার নিয়মাবলি সেরে একটি কক্ষে ঢুকলেন- ঢুকেই কী দেখলেন : তার প্রিয়তমা স্ত্রী ঐ কক্ষে। গুন্ডারা তাকে এখানে বিক্রি করে দিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী অনেকদিন পর এক-অপরকে কাছে পেয়ে আনন্দে কান্নায় ভেঙে পড়লো এবং কৌশলে উভয়ে বেরিয়ে এলো। তার দীর্ঘদিনের কষ্ট লাঘব হলো, সকল দুশ্চিন্তার অবসান ঘটল, মা হারা ছেলে মেয়েরা মাকে ফিরে পেল।

উল্লেখ্য যে, এখানে যদি মুরিদ নিজের ইচ্ছেকে প্রাধান্য দিয়ে দৃশ্যত মন্দ নির্দেশনা না মানত এবং সে অনুপাতে কাজ না করত, তাহলে তার মূল সমস্যার কোনো সমাধানই হতো না। হয়তো স্বামী আরেকটি বিয়ে করে সংসার পাতত। কিন্তু তার মা হারা সন্তানদের কী হতো। সন্তানহারা মায়ের কী অবস্থা হতো। সবকিছুর সফল সমাধান হলো একটি নির্দেশনা প্রশ্নাতীত ভাবে মেনে চলার মধ্যে।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

অর্থাৎ (হে ঈমানদারগণ) তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হয়েছে; অথচ ওটা তোমাদের অপছন্দ। আর হতে পারে তোমরা এমন কোনো বিষয়কে অপছন্দ করো- যা তোমাদের জন্য সর্বোত্তম। আর হতে পারে তোমরা এমন কোনো বিষয়কে পছন্দ করে থাকবে যা তোমাদের জন্য সবচেয়ে খারাপ। আর আল্লাহ্ তা জানেন যা তোমরা জানো না। (সূরা বাকারা-২১৬)

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ্র ইচ্ছের মধ্যে নিজের ইচ্ছেকে ফানা করে দেওয়ার বিষয়টি নিহিত। মহান আল্লাহ্র ইচ্ছেই বান্দার জন্য সর্বোত্তম। তাই সুলতানুল আরেফিন বায়েযিদ বোস্তামি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন–

ارید ان لا ارید

অর্থাৎ আমি এখন দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করেছি যে, কোনো ইচ্ছেই করবনা।

আরেফ রুমি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

ترک ندت ہاوشہون ہاسخاست–ہر کہ در شہوت فروشد بر نخاست

অর্থাৎ দৈহিক ফাসাদ সমূহ ও নফ্সের কু-প্রবৃত্তি বর্জন করা– দেহের দানশীলতা। যে ব্যক্তি নফ্সের খাহেশ পুরণে ডুবে যাবে-সেখান থেকে বেরিয়ে আসা অধিকাংশের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

লেখক :

চেয়ারম্যান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, বাংলাদেশ
শায়খুল হাদিস, সোবহানিয়া আলিয়া মাদ্রাসা, আসাদগঞ্জ, চট্টগ্রাম।

তরিকতের আলোকে ধর্মীয় স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ

✍ ডা. মোহাম্মদ শফিউল হাসান

সূচনাঃ

'দারুল ইরফান রিসার্চ ইনস্টিটিউট (DIRI)', দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম এর উদ্যোগে 'গাউছিয়ত নীতি' স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। DIRI এর সম্মানিত ম্যানেজিং ট্রাস্টি জনাব শাহজাদা সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারীর অনুপ্রেরণায় উপরোল্লিত বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ যেন সহায় হোন।

শিক্ষা :

সুধী পাঠক, আপনারা জানেন শিক্ষা হলো ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি ভলো-মন্দের তফাত করতে পারেন। আমাদের রাসুল বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। তিনি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) এর মাধ্যমে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন পড়েছেন এবং তার আলোকে সারা বিশ্বে আল-কুরআনের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি ঐশী আলোকে আলোকিত ও শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। শুরুতে তাঁকে বলতে বলা হয়েছিল "ইকরা" বা পড়ো। তিনি বলেছিলেন, আমি তো পড়তে জানি না। তখন আল্লাহ্‌র প্রেরিত ফেরেশতা জিবরাইল (আলাইহিস সালাম) বললেন, আপনি আমার সাথে পড়ুন "আমি আল্লাহর নামে শুরু করছি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন"। শেষ নবির ওফাতের পরে খোলাফায়ে রাশেদার যুগের শেষে যুগে যুগে কোরআনের আলোকে রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদর্শ অনুসরণ করে মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য সুফি সাধকের আবির্ভাব ঘটে– যাঁদের মাধ্যমে তরিকতের নীতিমালার চর্চা শুরু হয়। যার ফলে রিপুর নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়ে মানুষের আত্মাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়। প্রতিটি মানুষের আত্মার মাধ্যে দুটি সত্তা বিরাজমান :

১. নফ্‌সে মুৎমায়িন্না বা ভালো আত্মা যেখানে মনুষ্যত্ববোধ থাকে।

২. নফ্সে-আম্মারা বা মন্দ আত্মা যেখানে পশুত্ববোধ লুকিয়ে থাকে। মানুষ যখন নফ্সে মুৎমায়িন্না দ্বারা পরিচালিত হয় তখন পশুত্ববোধ লোপ পায় যার ফলে মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত থাকে। আর যখন নফ্সে আম্মারা সক্রিয় হয় তখন মানুষের মনুষ্যত্ববোধ লোপ পায় এবং পশুত্ববোধ জাগ্রত হয়। তখন মানুষের ভালো-মন্দ পৃথক করার ক্ষমতা থাকে না। মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন "Human mind is very complex" তার কারণ হলো মস্তিষ্কের স্নায়ুতন্ত্রের জটিলতা। মন যে এক বিচিত্র বিশাল জগৎ যা অনুভব করতে হয়। জার্মান মনোবিজ্ঞানী "Sigmund freud" মানুষের মন নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। গবেষণার ফলে অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। Freud এর মতে মনকে ডায়মন্ড আকৃতি দিয়ে নিম্নরূপভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। ID, Ego, Super Ego.

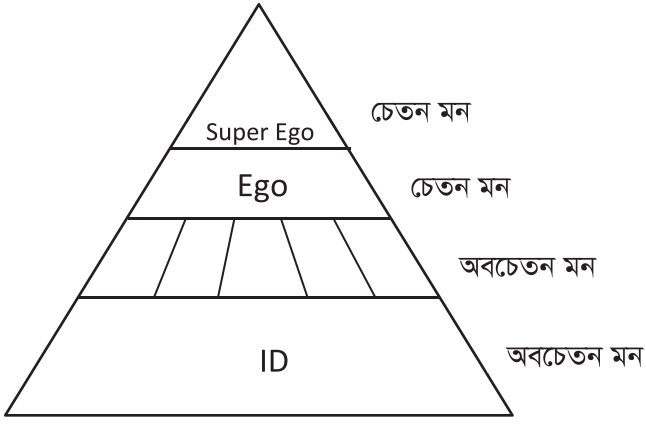

মানসিকতা ও মনোরোগ :

প্রিয় পাঠক, এবার আসা যাক মানুষের মানসিকতা নিয়ে আলোচনায়। মানসিকতা হলো মানুষের মনোভাব, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। মানসিকতা গঠিত হয় জন্মগত এবং পরিবেশগত। সুধীমণ্ডলী, এবার আসা যাক মনোরোগ নিয়ে আলোচনায়। সাধারনত মনের রোগের বহুবিধ কারণ থাকে শরীরের রোগের বেলায়ও একটি বা বহুবিধ কারণ থাকতে পারে। সাধারণত মনের উপর অত্যধিক মানসিক চাপ প্রয়োগের ফলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ দেখা দেয়। মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব বিভিন্ন ধরনের মানসিকতার উপর

নির্ভর করে। এসব আলোচনার উদ্দেশ্য হলো মন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, মনের যত্নে মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করা, মানসিক রোগ প্রতিরোধে সবাইকে সচেতন করা।

ধর্মীয় স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ :

এবার আসা যাক তরিকতের আলোকে ধর্মীয় স্বাস্থ্য ও মানসিক রোগ নিয়ে আলোচনা। মন, মানসিকতা ও মনোরোগ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। স্বাস্থ্য বলতে বিজ্ঞানীরা শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাস্থ্যের সমন্বয়কে বলে থাকেন। মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হলে শরীর, সমাজ ও ধর্মকে গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমানে আধুনিক যুগে কিছু কিছু মানুষের ধর্ম বিরোধী মানসিকতার ফলে মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাবের ঊর্ধ্বগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ধর্মবিদ্বেষী মনোভাবের ফলে উন্নত বিশ্বে মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি। অনুন্নত দেশের ধর্মীয় রীতিনীতির কারণে তাই হয়ে থাকে। সারা বিশ্বে প্রতি চার জনের মধ্যে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ মানসিক সমস্যায় ভোগেন। প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষ কর্মক্ষেত্রে মানসিক সমস্যার শিকার হয়ে থাকেন। সারা বিশ্বে প্রতিবছর মানসিক সমস্যার জন্য ২.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়ে থাকে যা ২০৩০ সালের মধ্যে ৬ ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছাবে। ধর্মীয় অনুশাসণ অনুসরন করলে বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায়; বিশেষ করে রিপুর জন্মগত চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

উপসংহার :

বর্তমান যুগে মুসলিম জাতির চরম অধঃপতনের মূল কারণ কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন যাপন থেকে দূরে সরে যাওয়া; যার ফলে মানুষ হতাশাগ্রস্থ হয়ে মানসিক সমস্যায় ভুগছেন। এসব মানসিক সমস্যা থেকে পরিত্রান পেতে হলে আল্লাহ ও তার রাসুলের পথ অনুসরণ করতে হবে এবং তরিকত ভিত্তিক আধ্যাত্মিকতা অনুসরণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্য। ইবাদত করার পূর্বশর্ত হলো পরিশুদ্ধ আত্মা বা "নফসে মুৎমায়িন্না"-য় উপনীত হওয়া। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে করিমে বলেছেন : "ইয়া আইয়্যুহান নাফ্‌সুল মুৎমায়িন্না, ইরজেয়ী ইলা রাব্বিকা রাদিয়াতাম মারদিইয়া, ফাদখুলী ফি এবাদি ওয়াদখুলী জান্নাতী।" অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন : হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।

বর্তমান সময়ে এই নফ্সে মুৎমায়িন্না অর্জন করতে হলে হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত 'উছুলে ছাবয়া'র প্রথম অংশ 'ফানায়ে ছালাছা' বা 'গাউছিয়ত নীতি' গ্রহণপূর্বক তা চর্চায় অভ্যস্ত হওয়া সহজপন্থা। এই গাউছিয়ত নীতির তিনটি ফানা সমন্বয়ে সংগঠিত।

যথা :

১। কারও নিকট কোনো রূপ উপকারের কামনা না করা। এতে স্বাবলম্বিতা অর্জনে মানসিক শান্তি অর্জিত হয়।

২। যা না হলে চলে, এই রূপ অনর্থক কথা ও কাজকর্ম ত্যাগ করা। এতে জীবনযাত্রা সহজ সরল হয়, মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক থাকে।

৩। নিজ ইচ্ছার বিলীন ভাব এবং খোদার ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া। এতে হতাশা থেকে মনমুক্ত থাকে। ফলে মনের প্রফুল্লতায় পারিবারিক ও সমাজজীবন আনন্দদায়ক ও শান্তিপূর্ণ হয়।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কুরআন ও হাদিস বোঝার এবং অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন যাতে করে আমরা সুস্থ থাকতে পারি; বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচর্যা করতে পারি। আ–মি–ন।

লেখক :
মনোরোগ বিশেষজ্ঞ;
প্রাক্তন সহযোগী অধ্যাপক, মানসিক রোগ বিভাগ,
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল;
অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, মানসিক রোগ বিভাগ
ইউ. এস. টি. সি. ফয়েস লেক, চট্টগ্রাম।

যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগরণে ‘গাউছিয়ত নীতি’-র ভূমিকা

✍ ড. মোহাম্মদ জাফর উল্লাহ

ভূমিকা :

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো মানবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনা; কেননা, মানুষ এখন মানুষকেই বেশি ভয় পায়। অন্যান্য সৃষ্টি মানুষের জন্য ততটা ভয়ংকর নয়– যতটা মানুষ মানুষের জন্য ভয়ংকর। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক লোকই যুব সমাজের গণ্ডিতে পড়ে। কেননা, পরিভাষায় বালেগ হওয়ার বয়স থেকে (১৪ বছর থেকে) ৪০ বছর পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তি যৌবনের। এ দিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً

অর্থাৎ, এভাবে সে সুদৃঢ় হয় এবং চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছে। (সুরা আহক্বাফ : ১৫)

মানুষ তার জীবনে কয়েকটি ধাপ অতিক্রম করে। প্রথম ধাপে মানুষ দুর্বল থাকলেও পরে পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী হয়। আবার ৪০ বছর পর পুনরায় দুর্বল হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা এ প্রসঙ্গে ইরশাদ করেছেন :

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ ضُعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ ضُعْفًا وَّشَيْبَةً

মহান আল্লাহ তিনি, যিনি তোমাদের দুর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিশালী করেছেন। অতঃপর শক্তিশালীর পর পুনরায় দুর্বল ও বৃদ্ধ করেছেন। (সুরা রুম : ৫৪)

জরিপে দেখা যায় যে, মানব জাতির শতকরা চল্লিশ ভাগ যুবক, ২২ ভাগ শিশু, ১৫ ভাগ প্রৌঢ় এবং অন্যান্য লোকের সংখ্যা ২০ ভাগ। যেহেতু মানব

জাতির প্রায় অর্ধেক মানুষই যৌবনের পরিমণ্ডলে সেহেতু যুবকদের উপরই মানব জাতির সমৃদ্ধি ও সাফল্য অনেকাংশে নির্ভরশীল। যুবকদের গুরুত্ব দিয়ে পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَاَهُمْ بِالْحَقِّ ؕ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنٰهُمْ هُدًى ﴿۱۳﴾

আমি আপনাকে তাদের কাহিনি বর্ণনা করছি, তারা ছিল যুবক যারা তাদের প্রভুর উপর ইমান এনেছিল এবং আমি তাদের ইমান আরও বৃদ্ধি করে দিয়েছি। (সুরা কাহাফ : ১৩)

যুব সমাজের ইমান উপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করে তাদের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যুব সমাজের গুরুত্ব বর্ণনা করে ইরশাদ করেন :

عن أبي هريرة :عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তাআলা তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দেবেন : এক. ন্যায়পরায়ণ ইমাম, দুই. যুবক যে আল্লাহ্‌র ইবাদতে বড়ো হয়। তিন. সে ব্যক্তি যার কলব মসজিদের সাথে সম্পর্কিত থাকে। চার. সে দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র কারণে পরস্পরে ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ, তারা ভালোবাসার কারণে একত্রিত হয় এবং ভালোবাসার কারনে পৃথক হয়। পাঁচ. সে ব্যক্তি যাকে কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সুন্দরী আহ্বান করে আর সে বলে যে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি। ছয়. সে ব্যক্তি যে এভাবে দান করে যে, তার বাম হাত জানে না, তার ডান হাত কী দান করেছে । সাত. সে ব্যক্তি যে একাকী আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে এবং অশ্রু বিসর্জন করে। (বুখরি শরিফ হাদিস নং-৬২৯)

এই হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুব সমাজকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যুবসমাজ যাঁরা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাদের প্রশংসা করেছেন।

মানুষ ছোটো বয়সে যে রূপ কোমলমতি হয় সেরূপ পড়ন্ত বয়সেও শান্তিকামী হয়ে যায়। যৌবনেই মানুষ প্রবৃত্তির তাড়নায় বেশি বিপথগামী হয়। মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে পশু রূপে। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন,

ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه

كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء

অর্থাৎ, প্রত্যেক নবজাতক ফিতরতে ইসলামের উপরই বা মানবিক গুণাবলির উপর জন্ম নেয়; কিন্তু তার মাতাপিতা তাকে ইহুদি বা নাসরা বা অগ্নি-উপাসক করে। যেমন চতুস্পদ জন্তু পরিপূর্ণ চতুস্পদ জন্তু জন্ম দেয়, যাতে তোমরা কেনো অপূর্ণতা দেখনা। (বুখারি শরিফ-হাদিস নং-১২৯২)

মানুষ পরিবার ও পরিবেশের কারণে মানবিক রাস্তা থেকে বিচ্যুত হয়। আস্তে আস্তে মানুষ হয়ে যায় দানব। মানুষকে পবিত্র করার জন্য মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার আগমন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন :

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۚ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿١٦٤﴾

অর্থাৎ: নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ইমানদারদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে তিনি তাদের মধ্যে হতে তাঁর রাসুল প্রেরণ করেছেন: যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান এবং তাদের পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও যারা ইতঃপূর্বে প্রকাশ্য গুমরাহ ছিল। (সুরা আলে ইমরান : ১৬৪)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢﴾

অর্থাৎ, তিনি সে সত্তা যিনি উম্মিদের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছেন। সে রাসুল তাদেরকে আল্লাহ তাআলার আয়াত তেলাওয়াত করে শোনান এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন যদিও তারা ইতঃপূর্বে প্রকাশ্য গুমরাহিতে ছিল। (সূরা জুমুআ : ২)

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয় গভীরভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, আল্লাহ তাআলা- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ এর পূর্বে وَيُزَكِّيهِمْ উল্লেখ করে শরিয়তের বিধিবিধান শেখার সাথে সাথে তাজকিয়ায়ে নফ্স করার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন; কেননা, অন্তরাত্মা পরিষ্কার না হলে কখনও শরিয়তের বিধিবিধান পালন করে মহান আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব নয়।

তাই গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর 'গাউছিয়ত নীতি' হলো আত্মশুদ্ধির সর্বজনীন একটি কোর্স; যা অনুসরণে যুব সমাজকে তার নিজের জীবন যৌবনের সঠিক মূল্যায়ন সম্পর্কে ভাবিয়ে তুলে। কারণ 'গাউছিয়ত নীতি'র অনুসরণ শিখায় যে, উপকারবিহীন কথা, কাজ, বাক-বিতণ্ডা পরিহার করে নিজ শক্তি সামর্থ্যে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়া। সকল ধরনের মদ, গাঁজা, বিড়ি-সিগারেট, অশালীন পোশাক পরিচ্ছেদ, উচ্ছৃঙ্খলা-বিশৃঙ্খলা, গৌরব ও ফ্যাশন-ভূষণের পরিহার করা উভয় জগতের কল্যাণের জন্যে একান্ত আবশ্যক। এতে যুবকের চরিত্র হয়ে উঠে কোমল। জীবন হয়ে ওঠে সুন্দর।

কলব বা অন্তর পরিষ্কার কাজে বেশি মনোনিবেশ করতে হয়। আল্লাহ তাআলা মানুষকে নফ্সে আম্মারা নামক এক নফ্স দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। (সুরা ইউসুফ, ৫৩)

এ নফ্সকে পরিষ্কার করতে না পারলে মানুষ বিপথগামী হয়। শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। মুহূর্তের মধ্যে আকাশ থেকে মাটিতে ফেলে দেয়।

উল্লেখ্য, আল্লাহ তাআলা মানুষকে নফ্সের সাথে সাথে একটি কলবও দিয়েছেন। নফসের তাজকিয়া করতে না পারলে, এর প্রভাবে পবিত্র কলবও আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। কল্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষের চিন্তাশক্তি ও আকলের উপর প্রভাবশালী। কাল্বের দুটি দিক রয়েছে, যার

একটি নফ্সের দিকে ও অপরটি রুহের দিকে । নফ্সের তাজকিয়া করতে না পারলে কলব পরিষ্কার থাকে না। আবার কল্ব যতক্ষণ পরিপূর্ণ নুরানি বা আলোকিত হয় না ততক্ষণ এটি রুহের দিকে পূর্ণ মুতাওয়াজ্জেহ হয় না। রুহ্কে কলুষমুক্ত রাখতে চাইলে প্রথমে নফ্স ও কাল্বের পরিচর্যা করতে হবে।

হাদিস শরিফে এ বিষয়ে ইরশাদ হয়েছে :

إن في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب

অর্থাৎ, মানুষের শরীরে এমন একটি টুকরা রয়েছে যদি সে টুকরো শুদ্ধ হয় তবে পুরো শরীর শুদ্ধ হয়ে যায় আর যদি সেটি অশুদ্ধ হয় তবে পুরো শরীর অশুদ্ধ হয়ে যায়। আর সেটি হলো মানুষের কল্ব। (সহিহ বুখারি হাদিস নং : ৫২)

মানুষের কল্ব নফ্স আম্মারা ও শয়তানের কুমন্ত্রণার কারণে অপবিত্র হয়। আমাদের ইমনি সম্পদ নষ্ট হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণে ও শয়তানের ওয়াস্ওয়াসায়। আমরা মুখে আল্লাহ তাআলার মুহাব্বতের দাবি করলেও বাস্তবে দুনিয়ার প্রতি মুহাব্বতের কাছে আমরা প্রতিনিয়ত হেরে যাচ্ছি। প্রবৃত্তির কাছে আমরা প্রতিনিয়ত বন্দি হয়ে পড়ছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন মাজিদে সতর্ক করে বলেন :

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ ؕ اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيْلًا ﴿۴۳﴾

আপনি কি সে ব্যক্তিকে দেখেননি যে তার প্রবৃত্তিকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে। আপনি কি তার ওয়াকিল? (সুরা ফোরক্বান, ৪৩)

অদ্যাবধি আউলিয়া কেরাম সলফে সালেহিন মনের চিকিৎসায় যে পরিশ্রম করে চলেছেন, যে শিক্ষাদীক্ষার দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, তা কোনো আহলে ইল্মের কাছে গোপন নয়। মানুষের কলুষিত মনকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; কারণ 'ফানা আনিল এরাদা'র শিক্ষা হলো খোদার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজের ইচ্ছাকে নত করে মঙ্গল ও কল্যাণদায়করূপে ধ্যান করা। যেহেতু আল্লাহ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। পবিত্র কুরআন সুন্নাহ-র আলোকে কাল্বের পবিত্রতা অর্জনই তাসাউফ।

মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষের মানবিক মূল্যবোধ থাকার কথা; নতুবা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য থাকবে না। আর

মানুষ হয়েও যাদের মানবিক মূল্যবোধ নেই তারা পশুতুল্য; বরং পশুর চেয়েও পথভ্রষ্ট। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ

بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ﴿۱۷۹﴾

"তাদের (বহু জিন ও মানুষ) অন্তর আছে, যা দিয়ে তারা (হক) উপলব্ধি করে না; তাদের চোখ আছে, যা দিয়ে তারা (ভালোকিছু) দেখে না এবং তাদের কান আছে, যা দিয়ে তারা (ভালো কিছু) শোনে না। (এ কারণে) তারা পশুতুল্য; বরং অধিক পথভ্রষ্ট আর গাফিল।" (সুরা আরাফ, ১৭৯)

কারও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়, তার কর্মের মাধ্যমে। বর্তমান বিশ্বেও যুব সমাজের নৈতিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় পর্যবেক্ষণ করে নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, যুব সমাজের বড় একটি অংশ তাদের মানবিক মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে; যার ফলে তারা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সমাজকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। সমাজ ও জাতির বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হলো যুব সমাজ । তাই তাদের মানবিক মূল্যবোধ জাগানো নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ দেশ ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন নির্ভর করে যুব সমাজের ওপর। তারাই জাতিকে সামনে নিয়ে যায়। মানবিক মূল্যবোধ জাগরণের অত্যন্ত কার্যকর ও স্থায়ী পদ্ধতি হলো অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা যাকে 'গাউছিয়ত নীতি'তে 'ফানা আনিল হাওয়া' বলা হয়েছে। এ গাউছিয়ত নীতির অনুসরণই পারে যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগাতে।

মানবিক মূল্যবোধ জাগরণে 'গাউছিয়ত নীতি' :

যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগরণের ভূমিকা জানার পূর্বে মূল্যবোধ হরণের কারণ জানা প্রয়োজন। মানবিক মূল্যবোধ মানুষের সহজাত একটি গুণ। অনেকে এটি হারিয়ে ফেলে। এটি হারানোর প্রধান কারণ হলো প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি ও মানুষ এ দুটি পৃথক কোনো অঙ্গ নয়; বরং উভয়ের সমন্নয়েই মানুষ পরিপূর্ণ হয়। এ প্রবৃত্তি মানুষকে ভালো ও মন্দ উভয় প্রকার কাজের নির্দেশ দিতে পারে। এটি ভালো কাজের নির্দেশ দিলে তাকে সুপ্রবৃত্তি আর মন্দ কাজের নির্দেশ দিলে, তাকে কুপ্রবৃত্তি বলা হয়। কিন্তু মানুষের প্রবৃত্তি সাধারণত সদা মন্দ কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

"নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।" (সুরা ইউসুফ, ৫৩)

মানুষ যতক্ষণ এটিকে নিয়ন্ত্রণ করে না, ততক্ষণ এটি মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে প্রবৃত্তির চাহিদার কারণে বর্তমান বিশ্বের যুব সমাজ জৈবিক ও দৈহিক চাহিদাকে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং একেই তারা পার্থিব জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছে। ফলে তারা এ চাহিদা পূরণ করার জন্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হচ্ছে, নিমজ্জিত হচ্ছে পাপাচারে, ত্যাগ করছে সৎকাজ। যুব সমাজের মধ্যে এ রকম আরো অসংখ্য অসদগুণ যেমন হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা, অতি জাগতিক চাহিদা, বিলাসিতা প্রভৃতির জন্ম হয়েছে। এ সকল চাহিদা পূরণে যুব সমাজ ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। নীতি-নৈতিকতার চেতনা হারিয়ে অনৈতিক সকল কাজ করতে তারা দ্বিধা করে না। তারা অপরাধকে অপরাধই মনে করে না যেন তারা মানবরূপী পশুতে পরিণত হয়েছে। ফলে তাদের কারণে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি যেমনি নষ্ট হচ্ছে, তেমনই তারা নিজেদের অজান্তে নিজেদের ধ্বংস করে দিচ্ছে।

যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগাতে হলে তাদের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা জানতে হবে। প্রবৃত্তিকে সংশোধন ও নিয়ন্ত্রণ করা 'গাউছিয়ত নীতি'র কাজ। আল্লামা ইবনে কাইয়ুম রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেন, "মানুষ কখনও প্রবৃত্তি থেকে আলাদা হতে পারবে না; যতদিন সে থাকবে ততদিন তার প্রবৃত্তিও থাকবে; এর থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। তাই ইসলাম তাকে প্রবৃত্তি থেকে আলাদা হতে বলেনি বরং তা নিয়ন্ত্রণ করার নির্দেশ দিয়েছে যেমন তাকে নারীর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করতে বলেনি; বরং তাকে বিবাহের নিদের্শ দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তার চাহিদা পূরণ করার বিধান দিয়েছে। ইসলাম এক থেকে চারটি পর্যন্ত বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। এভাবেই ইসলাম মানুষের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে; যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানব জাতিকে নৈতিক পদস্খলন, বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করা।" (ইবনুজ জাওজি, যাম্মুল হাওয়া,পৃ.৩৫)

যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির অনুসরণ ও তার চাহিদা পূরণে মশগুল থাকে, সে কার্যত প্রবৃত্তির দাস ও গোলামে পরিণত হয় এবং প্রবৃত্তি তাকে গ্রাস করে নেয় সম্পূর্ণরূপে। কারও অন্তরে যখন তার ভালোবাসার বস্তুটির চিত্র ফুটে ওঠে, তখন সে তাতেই নিমজ্জিত হয়ে পড়ে আর এগুলো একাকার হয়ে যায়

তার সত্তার সঙ্গে, যা থেকে উত্তরণ সম্ভব হয় না তার পক্ষে। কখনও এমন হয় লোভের কারণে, যেমন সম্পদ, সম্মান ইত্যাদির জন্য। প্রবৃত্তির অনুসারীরা আরও অনেক কারণে পানিতে নিমজ্জিত ব্যক্তির মতো প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণে আপাদ-মস্তক নিমজ্জিত হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রণহীন প্রবৃত্তির অনুসরণ নিন্দিত ও পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ يَلۡقَوۡنَ غَيًّا ﴿۵۹﴾

"তাদের পরে আসল এমন এক (অসৎ) বংশধর, যারা নামায বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং, শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।" (সুরা মারইয়াম, ৫৯)

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর অনুসারীদের প্রতি 'গাউছিয়ত নীতি'তে নির্দেশিত হয়েছে অনর্থ পরিহার করা। কাজেই একজন মাইজভাণ্ডারী তরিকার অনুসারী বা সুফি ব্যক্তি কোনোভাবেই পার্থিব সুখ-দুঃখের মোকাবিলায় আখেরাতের সুখ-দুঃখকে প্রাধান্য দিতে পারে না।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা গেল যে, মানবিক মূল্যবোধ হরণের প্রধান কারণ হলো কুপ্রবৃত্তির চাহিদা। আর সুফিবাদের অন্যতম সিলেবাস 'গাউছিয়ত নীতি'র মৌলিক শিক্ষা হলো 'তাজকিয়াতুন নফস' বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধকরণ। মানব ও জিন জাতির ভেতর-বাইর উভয় দিককে পরিশুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহির সালামকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন :

لَقَدۡ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الۡمُؤۡمِنِيۡنَ اِذۡ بَعَثَ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلًا مِّنۡ اَنۡفُسِهِمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِهٖ وَ

يُزَكِّيۡهِمۡ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡكِتٰبَ وَالۡحِكۡمَةَ ۚ وَاِنۡ كَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِىۡ ضَلٰلٍ مُّبِيۡنٍ ﴿۱۶۴﴾

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অবশ্যই অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসুল প্রেরণ করেছেন, যিনি তাঁর আয়াতসমূহ তাদের নিকট তেলাওয়াত করেন, তাদের পরিশুদ্ধ করেন এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন; যদিও তারা পূর্বে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিল।" (সুরা আলে ইমরান, ১৬৪)

রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজেও ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"(মানবজাতিতে) উত্তম চরিত্রে ভূষিত করতে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।" (ইমাম বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরাহ, খ.১০,পৃ.৩২৩)

হযরত রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শরিয়ত ও তরিকত তথা তাসাউফ উভয়ের ধারক ও বাহক। তিনি এ দু'টিকে তাঁর স্বীয় উম্মতকে বাস্তবরূপে শিক্ষা দিয়েছেন। তাঁর ওফাতের পর সুফি সাধকগণই ইলমে দ্বীনের ধারক-বাহক। দ্বীনের বাহ্যিক বিধি-বিধান মানা সাধারণভাবে সকলের পক্ষেই সম্ভব হয়; কিন্তু মানুষের অভ্যন্তরীণ জগৎকে পরিশুদ্ধ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। আভ্যন্তরীণ জগতের প্রবৃত্তিই মানুষের কর্মের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এতে যুব সমাজই বেশি আক্রান্ত হয়। ফলে তারা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হয়। এ কারণে সুফিয়ে কিরাম 'তাজকিয়াতুন নফস' বা প্রবৃত্তির পরিশুদ্ধিকরণের ওপর জোর দেন; কারণ কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা একান্ত প্রয়োজন; নতুবা তা সদা সৎকাজে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। এ কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ কাজ নয়। এ কারণে রাসুলে করিম প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কাজকে জিহাদে আকবর বা বড়ো জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পর রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সাহাবায়ে কিরামকে সম্বোধন করে ইরশাদ করেছেন :

مرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس

"তোমাদের প্রতি শুভেচ্ছা রইল যে, তোমরা ছোটো জিহাদ থেকে বড়ো জিহাদের প্রতি ফিরে এসেছো। জনৈক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসুল, বড়ো জিহাদ কী? তিনি উত্তরে ইরশাদ করেন : প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা।" যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে যুদ্ধ করাকে রাসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ছোটো জিহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন, আর অপরদিকে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে বড়ো যুদ্ধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন; কারণ প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। (ইমাম বায়হাকি, আয যুহদুল কবির,খ.১,পৃ.৩৩৮; ইমাম গাজালি, ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন,খ.৩,পৃ.৬৬)

তবে যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। আর কঠিন এ কাজের সহজ উপস্থাপনা হলো 'গাউছিয়ত নীতি'। যেমন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের কাজটি কঠিন হওয়া সত্ত্বেও, যদি এটি গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী

(কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)' এর সুফিদর্শনের আলোকে করা হয়, তা হলে তা আর কঠিন কাজ থাকে না। বরং নফ্ছ দমন হয়ে যায়। প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেলে, তা আর মন্দকাজের নির্দেশ দিবে না; বরং ভালো কাজের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করবে। ফলে যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগরণ ফিরবে। যার ফলে তারা যে চোখ দিয়ে মন্দবস্তু দেখত, তা আর দেখবে না। হাত-পা দিয়ে তারা যে অন্যায় করতো, তা থেকে বিরত থাকবে এবং মুখ দিয়ে যে অন্যায় করতো, তা থেকে তারা বিরত থাকবে। এক কথায় তারা এভাবে অনৈতিক ও পাপাচার সকল কাজ থেকে বিরত থাকবে। কারণ সকল অসদ্‌গুণের আধার ও নিয়ন্ত্রণকারী এখন তার নিয়ন্ত্রণে। যাঁরা প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাঁরাই সফলকামী। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝

"সফলকামী সেই, যে প্রবৃত্তিকে পরিশুদ্ধ করেছে।" (সুরা শামস, ৯)

নফ্স পরিশুদ্ধ করার উপায় :

নফ্স পরিশুদ্ধ করার অনেক উপায়ের মধ্যে সোহবত বা সান্নিধ্য এবং যিকরুল্লাহ বড়োই গুরুত্বপূর্ণ।

তাজকিয়ায়ে নফ্সের জন্য প্রথমে যে কাজ করতে হবে তা হলো ভালো মানুষের তথা সুফিগণের সান্নিধ্য গ্রহণ করা। 'গাউছিয়ত নীতি'র তেলাওয়াতে অজুদ পীরের আনুগত্যে মাধ্যমে খোদার সাহায্য কামনা, মোনাজাত, বিনয়ে প্রার্থনা শিখায়। সাহাবিগণ যেভাবে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সান্নিধ্য লাভ করে সোনার মানুষে রূপান্তরিত হয়েছেন এরূপ প্রকৃত নায়েবে রাসুলের সান্নিধ্যে মানুষ সোনার মানুষে রূপান্তরিত হতে পারে। আল্লাহ তাআল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সান্নিধ্য লাভকারী সাহাবিগণের সম্পর্কে বলেন-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ

অর্থাৎ : মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহ্‌র রাসুল। আর যারা তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছে, তাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা কাফিরদের উপর কঠোর, পরস্পরে দয়াবান, তারা রুকু ও সেজদাবনত। তারা আল্লাহ তাআলার করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের আশা করে। তাদের নিদর্শন হলো তাদের চেহারায় সেজদার চিহ্ন আছে। তাদের এসব গুণবলী পূর্বের কিতাব তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত হয়েছে। (সুরা ফাতাহ, ২৯)

সাহাবিগণ হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সান্নিধ্যে তাঁদের অন্তরাত্মা পরিশুদ্ধ করেছেন। নফসের তাজকিয়া করে তাঁরা সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। ইসলামি শরিয়তের বিধানানুযায়ী সাহাবিগণ সকল মুমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কেবল রাসুলুল্লাহর সান্নিধ্যের কারণে। বর্তমানে যুব সমাজের জন্য সত্যিকার কামিল মুমিন তথা নায়েবে রাসুলের সান্নিধ্য গ্রহণ করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তাযকিয়ায়ে নফ্‌সের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো-অধিক হারে আল্লাহ তাআলার যিকর করা। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾

অর্থাৎ, যারা ইমান এনেছে মহান আল্লাহ্‌র যিকিরে তাদের অন্তর প্রশান্ত হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার যিকিরের মাধ্যমে কল্‌ব প্রশান্তি লাভ করে। (সুরা রাদ, ২৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ﴿٨﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার যিকির করো এবং পরিপূর্ণ একগ্রতায় আল্লাহ্‌র যিকরে লিপ্ত হও। (সুরা মুয্‌যাম্মিল, ৮)

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) মানুষের তাযকিয়ায়ে নফ্‌সের জন্য আল্লাহ তাআলার যিকিরের আমল দেন। যাতে পর্যায়ক্রমে মানুষ তার নফ্‌সকে পরিশুদ্ধ করতে পারে। বর্তমান সময়ে যুবসমাজের জন্য 'গাউছিয়ত নীতি'র আলোকে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)-এর এ শিক্ষা লাভ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তাসাউফে যেভাবে তাযকিয়ায়ে নফ্সের শিক্ষা দেওয়া হয়। তেমনি তাসাউফের আরও দুইটি বড়ো শিক্ষা হলো : এক. আল্লাহ্কে (স্রষ্টাকে) ভালোবাসা দুই. সৃষ্টিকে ভালোবাসা। একজন মুসলমান যদি এ দুইটি লালন করতে পারে; যা বর্তমান সময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তবে মুসলমানরা পুরো বিশ্বের কাছে ইসলামকে এবং ইসলামের সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হবে।

আমরা (মুসলমানরা) এমন জাতি যারা আল্লাহ তাআলাকেও ভালোবাসি এবং তাঁর সৃষ্টিকেও ভালোবাসি। এ আহ্বানকে অস্বীকার করতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ নেই। এমন কি নাস্তিকেরাও এর বিরোধিতা করতে পারে না। কেননা, নাস্তিকেরাও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমঝোতাকে মানদন্ড মনে করে। আর সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার ও ভালবাসায় সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদি যুব সমাজ তাসাউফের শিক্ষায় 'গাউছিয়ত নীতি'র ত্রিবিধ নীতিমালায় প্রশিক্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে পারে যা আমাদের বর্তমান সমাজে খুবই প্রয়োজন তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

ভালোবাসা সৃষ্টি হয় রহমত থেকে। এ রহমতই সৃষ্টিজগতের ভারসাম্য রক্ষা করে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের শুরুতে বিসমিল্লাহ শরিফে নিজের নামের সাথে আর রহমান ও আর রহিম বিশেষণ যুক্ত করে এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

রহমত আল্লাহ তাআলার এক বড়ো গুণ। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ গুণে গুণান্বিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আমাদের সাথে, আমাদের পরিবারের সাথে, আমাদের বন্ধু বান্ধবের সাথে, আমাদের প্রতিবেশির সাথে রহমতের সম্পর্ক কীভাবে প্রতিষ্ঠিত করব? মানুষে মানুষে কীরূপ রহমত সৃষ্টি হবে? জীব জন্তু ও উদ্ভিদের সাথে কীরূপ রহমত প্রতিষ্ঠিত হবে? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফ থেকে খুঁজতে চেষ্টা করছি।

আমরা আমাদের উপর কীরূপে রহমত করব- এ বিষয়ে কুরআন মজিদে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ

আল্লাহ তাআলা কাউকেও সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেন না। (সুরা বাকারা, ২৮৬) অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাঁর সামর্থ্যানুযায়ী বিধিবিধান আরোপ করেন।

হাদিস শরিফে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন:

عَنْ عَائِشَةَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ فَذَكَرَتْ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَلَكِنَّ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত আছে, নিশ্চয় নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদা তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। তার পাশে একজন নারী ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ মেয়েটি কে? হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বললেন, তিনি অমুক, যিনি পুরো রাত না ঘুমিয়ে ইবাদত করেন। হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন, এত অধিক পরিশ্রম করা ছাড়ো, বরং তোমাদের সাধ্যানুযায়ী ইবাদত করো। আল্লাহ্‌র শপথ, তোমরা তোমাদের ক্লান্ত না করলে আল্লাহ্ তোমাদের ক্লান্ত করবেন না। মহান আল্লাহ তাআলার কাছে সে ধর্মপালনই বেশি পছন্দনীয় যা তোমরা নিয়মিত আদায় করো। (সুনান নাসাঈ : হাদিস নং-১৬৪১)

ইবাদতের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করার মাধ্যমে যেরূপ নিজেদের উপর রহমত করা যায়, সেরূপ গুনাহ্‌র কাজ থেকে বিরত থেকেও নিজেদের উপর রহমত প্রদর্শন করা যায়।

পরিবার পরিজনের সাথে রহমত প্রদর্শন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

عن الأسود قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه و سلم يصنع في بيته ؟ قالت كان يكون في مهنة أهله تعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة

হযরত আসউয়াদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, আমি হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ঘরে কী কাজ করেন? তিনি উত্তরে

বলেন, রাসুলুল্লাহ ঘরে পারিবারিক কাজে লিপ্ত থাকেন; অর্থাৎ, পরিবার পরিজনের সেবা করেন। আর যখন নামাযের সময় হয় তিনি নামাযের জন্য বের হয়ে যান। (সহিহ বুখারি : হাদিস নং-৬৪৪)

عن انس رضى الله - خدمت النبي صلي الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اف ولا لم صنعت؟ ولا ألا صنعت؟

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত আছে : তিনি বলেন, আমি দশ বছর হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার খিদমত করেছি; তিনি কখনও আমাকে একবারের জন্য 'উফ'! বলেন নি। তিনি কখনও বলেন নি তুমি এটি কেন করেছ বা এটি কেন করনি। (সহিহ বুখারি শরিফ : হাদিস নং-৫৬৯১)

যদি আমাদের যুবসমাজ রাসুলুল্লাহর এ আদর্শ নিজেদের মধ্যে চর্চা করে, তবে তারা তাদের ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

জীব জন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থের সাথে রহমত দয়া প্রদর্শন বিষয়ে অসংখ্য হাদিস থেকে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো :

عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها الا ساله الله عنها؟ قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي به

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত : হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন-যদি কোন মানুষ অন্যায়ভাবে চড়ুই পাখি বা তার চেয়ে ছোটো কোনো পাখি হত্যা করে, আল্লাহ তাআলার কাছে তাকে কিয়ামত দিবসে জবাবদিহি করতে হবে। হে আল্লাহ্‌র রাসুল চড়ুই পাখির হক কী? তিনি উত্তরে বললেন, সেটি জবেহ করবে এবং আহার করবে কিন্তু সেটি মাথা কেটে ফেলবে না এবং তা নিক্ষেপও করবেনা। (সুনান কুবরা, নাসাঈ : হাদিস নং-৪৫৩৪)

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا هى اطعمتها ولا هى تركتها تاكل من خشاش الارض

হযরত আব্দুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন, এক রমণী জাহান্নামে প্রবেশ করেছে একটি বিড়ালের কারণে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল; সেটিকে পানাহার করাত না। আর সেটিকে ছেড়ে দিচ্ছিল না যেন সেটি মাটির ঘাস খেতে পারে। (সহিহ বুখারি : হাদিস নং-৩১৪০)

মাইজভাণ্ডারী তরিকার শিক্ষা হলো মানবতার শিক্ষা, সাম্য ও শান্তির শিক্ষা। মানবতাবাদী তাসাউফের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাজ্জাদানশীনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) ও নায়েব সাজ্জাদানশীন আলহাজ্ব সৈয়দ ইরফানুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) -অসুস্থ রোগীদের সেবার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তৈরি, দুস্ত এতিমদের জন্য আশ্রয় স্থল তৈরি, অসহায় বৃদ্ধদের জন্য আশ্রাম তৈরি করে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের প্রতি রহমত প্রদর্শনের মডেল বা নজির সৃষ্টি করেছেন।

বিশ্বায়নের এ যুগে পুরো পৃথিবী এখন একটি গ্রামে রূপান্তরিত হয়েছে। এসময়ে সাজ্জাদানশিনে দরবারে গাউছুল আজম আলহাজ্ব হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ এমদাদুল হক মাইজভাণ্ডারী (মাদ্দাজিল্লুহুল আলি) কল্যাণ ও ভালোবাসার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ধর্মের মৌলিক যে শিক্ষা তা বাস্তবায়নের প্রচেষ্টায় আছেন। ফলে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার সময়ে যেভাবে দলে দলে মানুষ ইসলামের শীতল পরশে প্রবেশ করে মুসলমান হয়েছেন, এখনও মানুষ দলে দলে মাইজভাণ্ডারী তরিকায় বায়াত গ্রহণপূর্বক সুশীতল আলয়ে প্রবেশ করছেন।

আমাদের যুব সমাজকে প্রকৃত অর্থে সুফিবাদের আদর্শে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে 'গাউছিয়ত নীতি' অনুসরন করা গেলে, সমাজে যেমন শান্তি বিরাজ করবে, তেমনি অস্থির পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে।

উপসংহার :

দুনিয়া একটি পরীক্ষাগার; মানুষকে প্রবৃত্তি দিয়েই আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন; যাতে তিনি দেখেন কারা তাঁর নির্দেশিত পথে চলে আর কারা

প্রবৃত্তির পথে চলে; কারণ উভয়ের প্রতিদান ভিন্ন। প্রবৃত্তির প্রকৃতি হচ্ছে মন্দকাজের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করা। এ প্রবৃত্তি যুব সমাজকে সহজে ও দ্রুত কাবু করতে সক্ষম হয়। এটি তাদের মূল্যবোধ হরণ করে। তাই তারা ভলো-মন্দের বিবেচনা যথাযথ করতে না পেরে সরল ও সঠিক পথ ও মত থেকে সরে যায়। ফলে তারা উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মানবিক মূল্যবোধ নামক মহৎ এ গুণটি যুব সমাজের মধ্যে জাগাতে সুফিবাদের অনন্য কর্মসূচি 'গাউছিয়ত নীতি'র বিকল্প নেই। তারা যদি এ ত্রিবিধনীতি ধারণ করে, তা হলে তাদের মানবিক মূল্যবোধ নামক অমূল্য সম্পদটি রক্ষা পাবে। এতে দেশ ও সমগ্র জাতির সার্বিক উন্নয়ন অনেকাংশে এগিয়ে যাবে। সুতরাং, যুব সমাজের মানবিক মূল্যবোধ জাগাতে তাসাউফের প্রচার-প্রসার বৃদ্ধি করতে হবে এবং 'গাউছিয়ত নীতি' সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এঁর দীক্ষায় যুব সমাজের মূল্যবোধ জেগে ওটুক-পরিশেষে এ কামনাই করছি।

লেখক :
অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবেশ সুরক্ষায় অপচয়রোধে 'ফানা আনিল হাওয়া'র গুরুত্ব

✍ মোঃ ইকবাল সরোয়ার

পরিবেশ বিষয়ক ভাবনা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে আলোচিত একটি বিষয়। ব্যক্তির জীবন-ধারার উপর প্রভাব বিস্তারকারী যাবতীয় উপাদানকে পরিবেশ বলে। যাবতীয় প্রাকৃতিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য পরিবেশের আন্তভুর্ক্ত এবং একটির সাথে অন্যটি ওতপ্রোতোভাবে জড়িত। শুধু মানবই নয়, যে কোনো প্রাণের ধারক জীবনী শক্তির যোগানদার হলো পরিবেশ। পরিবেশ ছাড়া প্রাণীর অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। মানুষকে কেন্দ্র করেই প্রকৃতি-পরিবেশ ও সমাজের সৃষ্টি। পরিবেশে মানুষের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো : পানি, বায়ু, মাটি ও জীব মণ্ডল। পানি, বাতাস ও মাটিসহ পরিবেশের কোনো উপাদানের যখন কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, জীবজগতের উপর নেতিবাচক ও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বা ফেলতে পারে তখন তাকে পরিবেশ দূষণ বলা হয়। পরিবেশ দূষণ বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে; যেমন : বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, শব্দদূষণ এবং মাটিদূষণ।

গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) কর্তৃক প্রবর্তিত 'উছুলে ছাবয়া' বা 'আত্মশুদ্বির সপ্তকর্ম পদ্ধতি'র অন্যতম **ফানা আনিল হা'ওয়া "অপচয়রোধ ও পরিবেশ সুরক্ষায়"** গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। ফানা 'আনিল হা'ওয়া' বা প্রবৃত্তির আনুগত্যমুক্ত হওয়া হলো : যা না হলে চলে, সে সব কাজ-কর্ম মুক্ত হয়ে জীবন যাপন করা, যা সমষ্টিগত ভাবে সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করে। পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও স্বাভাবিক রাখতে ইসলামে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে। সূরা বাকারায় (১৯৫) বলা হয়েছে : "তোমরা নিজেদের ধ্বংস নিজেরা ডেকে এনো না।" আবার সূরা আর রুম (৪১)-এ ইরশাদ করেছেন : "মানুষের কৃতকর্মের জন্য সমুদ্র ও স্থলে

বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ছে।" আসলে আমাদের অপরিনামদর্শী ও অপ্রয়োজনীয় কিছু কর্মকান্ডের জন্য ক্রমাগত মাটি, পানি ও বায়ু প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে 'আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি'র অন্যতম 'ফানা আনিল হা'ওয়া' আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে অপচয়-রোধ করে পরিবেশ সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে যে সমস্ত বিষয় সম্পর্কে নিষিদ্ধ করা হয়েছে তার অন্যতম হলো অপচয় এবং অপব্যয়। কুরআন শরিফে অপচয় এবং অপব্যয়ের ব্যাপারে নিষেধের কথা জানিয়ে সূরা আরাফ (৩১) এ বর্ণিত হয়েছে- "হে আদম সন্তান, তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করো। পানাহার করো, কিন্তু অপচয় করো না।" আবার সূরা বনি ইসরাইল (২৭) এ বলা হয়েছে : "অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবের বসবাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দুটি উপাদান হলো মাটি ও পানি। মূলত : মাটিকে কেন্দ্র করেই সবকিছু উৎপন্ন হয়, বসবাসের অন্যতম উপাদান ঘরবাড়ি তৈরী করা হয় এবং উৎপাদিত ফসল সমূহ মহান আল্লাহতা'লা পানি দ্বারা সজীব ও সতেজ রাখেন। মানুষের মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয় তার সবগুলোরই উৎস মাটি। তবে মানুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ মাটির ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে; তথা মাটি দূষিত হচ্ছে। অন্যদিকে, পানির ব্যবহার ব্যাপক ও সর্বত্র। আমরা তৃষ্ণা মেটাতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে, চাষাবাদের কাজে, শক্তির উৎস হিসেবে এবং আরও বিভিন্ন কাজে পানি ব্যবহার করে থাকি । নদী-নালা এবং পুকুর হচ্ছে আমাদের মিঠা পানির প্রধান উৎস। বিভিন্ন কারণে পানি ব্যবহার অনুপোযোগী হয়ে পড়তে পারে। মানুষসহ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য নিরাপদ নয় – পানির এমন অবস্থাকে পানি-দূষণ বলা হয়। পানি আল্লাহ্‌র একটি বিশেষ নিয়ামত; স্বয়ং আল্লাহ তার নিয়ামতসমূহ অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। বর্তমান পৃথিবীতে সুপেয় পানির ক্রমবর্ধমান অভাব ও দূষিত পানির পরিমাণ বৃদ্ধির মূলে রয়েছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পানির অপচয় আর অপব্যবহার। সবুজ সতেজ বাসযোগ্য এই পৃথিবীর মূলে রয়েছে পানির অসামান্য অবদান। পানির পর্যাপ্ত ও যথাযথ ব্যবহার এবং দূষণ রোধ সম্পর্কে আমাদের সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে পানির অপর নাম জীবন। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র তথ্য অনুযায়ী, দূষিত পানি পান করার

ফলে প্রতিবছর সমগ্র বিশ্বে কয়েক লাখ শিশুর মৃত্যু হয়; আবার দূষিত পানি পান করার ফলে অনেক সময় জন্ম নেয় বিকলাঙ্গ শিশু।

নগরীর পুকুর জলাশয়সমূহ পানি চক্রের ক্ষুদ্রতম একটি অংশ। নগরের পুকুর জলাশয়সমূহ তাপমাত্রা কমাতে এবং বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি ধারণ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। নগরের পুকুর দিঘি ও জলাশয় সমূহ মৎস্য চাষসহ জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। তা ছাড়া এই জলাধারসমূহ মৎস্য শিকার, সাঁতার কাটা, সাঁতার শেখা ও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে নগর পরিবেশে ব্যবহৃত হতে পারে। অগ্নি দুর্ঘটনায় পানি সরবরাহে পুকুর ও জলাশয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। নির্বিঘ্নে আগুন নেভানোর সুবিধার জন্য প্রত্যেক এলাকায় পুকুর, দিঘি বা জলাশয়গুলো সংস্কার ও সংরক্ষণে সবাইকে এগিয়ে আসা জরুরি। পানির টেকসই ব্যবহার ও রক্ষার জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন ও সক্রিয় হতে হবে। পানি দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ, চাষাবাদ, গৃহস্থালি, রান্নারকাজ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্য রক্ষা, সংস্কৃতি, পয়োনিষ্কাশন সর্ব ব্যবস্থায় পানির অবদান ও ভূমিকা অনস্বীকার্য। পানির গুরুত্ব যথাযথ মূল্যায়ন পূর্বক এর টেকসই ব্যবহার আমাদের নিশ্চত করতে হবে। টেকসই পরিবেশ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতি ও কল্যাণের জন্য পানি সম্পদের গুরুত্বপূর্ন অবদান বজায় রাখতে 'উছুলে ছাবয়া'র অন্যতম 'ফানা আনিল হা'ওয়া' ব্যাপক প্রচার প্রয়োজন।

পরিবেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পাহাড়। এই পাহাড়ের পরিবেশ, প্রাণীকূল উদ্ভিদ সম্পূর্ণ ভিন্ন; কিন্ত আমাদের অপরিণামদর্শী কর্মকান্ডের জন্য পাহাড় সমূহ আজ বিপন্ন। পবিত্র কুরআনের সূরা নাবা (৭) তে আছে : "আর পাহাড়গুলোকে পেরেকের মতো গেড়ে দিয়েছি।" অথচ আমরা অপ্রয়োজনে পাহাড় কেটে, গাছ কেটে, পুকুর ভরাট করে পরিবেশ-প্রতিবেশ নষ্ট করছি প্রতিনিয়ত। আবাসনের ব্যবস্থা করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহার করছি পাহাড় কাটা মাটি । আইনত নিষিদ্ধ থাকলেও প্রতিনিয়ত অপরিকল্পিতভাবে চলছে পাহাড় কাটা যার ফলে বৃদ্ধি পাচ্ছে বর্ষা মৌসুমে পাহাড় ধসের মতো মর্মান্তিক মানব সৃষ্ট দুর্যোগ।

খাদ্যের উৎস, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিনোদন এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণীকুলের জীবন ধারণের সামগ্রিক উপাদান সংগ্রহ করা হয় বৃক্ষ থেকে। বৃক্ষ হচ্ছে বৃষ্টির নিয়ামক এবং মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধিকারক। এ ছাড়া আমরা পৃথিবীতে সবুজ উদ্ভিদের বদৌলতে বেচেঁ আছি। সারা বিশ্বের অস্তিত্বসহ

সব মানুষের খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা মেটাতে আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। গাছপালা ও বনভূমি পরিবেশের অপরিহার্য অঙ্গ। বৃক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমাদের অনেক উপকারে আসে। গাছপালা না থাকলে পরিবেশ উত্তপ্ত হবে, বৃষ্টিপাত কমে যাবে, মাটির উর্বরতাশক্তি কমে যাবে, বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বেড়ে যাবে, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পাবে, অক্সিজেন কমে যাবে। সর্বোপরি, এই পৃথিবী মানুষের বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে পড়বে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইসলামে বৃক্ষরোপণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে বারবার। এমনকি বৃক্ষরোপণকে সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণের পর যতদিন পর্যন্ত মানুষ ও জীবজন্ত ওই বৃক্ষ থেকে প্রাপ্ত ফল-ফলাদি ভোগ করবে, আশ্রয় নিয়ে ছায়া নিবে, ততদিন পর্যন্ত রোপণকারীর আমলনামায় সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব লিখা হতে থাকবে। সহিহ বুখারি : ২১৫২।

আমরা দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু অতিরিক্ত কর্মকাণ্ড করি যা নিতান্তই না হলে চলে। এসব অতিরিক্ত অপচয় ও অপব্যয়ের কারণে আমাদের জীবন থেকে বরকতও হ্রাস পায়। যার ফলে মানুষের ধন-সম্পদ ক্রমাগত কমতে থাকে। যেমন : আধুনিক জীবনে প্রায় সবার ঘরেই একাধিক ফ্রিজ, বৈদ্যুতিক সামগ্রী, আসবাবপত্র রয়েছে। এখন সময় এসেছে বাস্তবিক অর্থে চিন্তা করার আমাদের জীবন চলার পথে আদৌ এতকিছুর প্রয়োজন রয়েছে কি না? আল্লাহ বলেন : "তোমরা আহার করো ও পান করো, কিন্তু অপব্যয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আরাফ : ৩১)। আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শুধু লোক দেখানোর জন্য অনেক অনুষ্ঠানে প্রচুর ভোজের আয়োজন করা হয়; কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় এসব অনুষ্ঠানে খাবারের প্রচুর অপচয় হয়। আবার এসব খাবার তৈরিতে প্রয়োজন প্রচুর জ্বালানি, যা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী কার্বন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। মহান আল্লাহ তার নিয়ামত অপচয় করতে নিষেধ করেছেন। বিদ্যুতের সাম্প্রতিক যে অভাব তার জন্য আমাদের বিদ্যুত ব্যবহারে অসচেতনতা ও উদাসীনতাই অন্যতম কারণ। অত্যধিক ও অপ্রয়োজনীয় বিলাসী বৈদ্যুতিক সামগ্রী ব্যবহার আমাদের বিদ্যুতের চাহিদাকে দিনদিন বৃদ্ধি করছে। অপচয় যে শুধু আর্থিক ক্ষতি ডেকে নিয়ে আসে তা নয়, অপচয়/অপব্যয়ের কারণে আর্থিক ক্ষতির চেয়েও দেশ ও সমাজের আরও অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। বর্তমান সময়ে দেশব্যাপী

যে পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস সংকট তার জন্য দায়ী মূলত : আমাদের অপরিণামদর্শী অপচয় ও অপব্যয়। 'ফানা আনিল হাওয়া'র গুরুত্ব অনুধাবন করে আমাদের সকলকে বিদ্যুৎ সহ প্রয়োজনীয় জিনিস সমূহের ব্যবহারে সচেতন হতে হবে এবং পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। সুতরাং, পরিবেশের এই সকল উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে যাতে অপচয় না হয় সেজন্য প্রয়োজন সচেতন ও সতর্ক হওয়া।

লেখক :
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
iqbalsrwr@cu.ac.bd

‘ফানা আনিল খাল্ক’ অবলম্বনে

আল্লাহ তা‘আলা প্রদত্ত শক্তি সামর্থ্যের উপর আস্থাশীলতার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন

✍ সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন আল আযহারী

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত জাতি হিসেবে ঘোষণাপূর্বক ইসলামকে তাদের জন্য একমাত্র মনোনীত ধর্ম ও পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আর ইসলাম মানবজাতির জন্য কল্যাণের নিয়ামক হিসেবে শান্তির বার্তা নিয়ে আবির্ভূত হয়ে মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলের যাবতীয় বিষয়ের হিকমতপূর্ণ সমাধান প্রণয়ন করেছে। এটি মানুষের জন্য যা কল্যাণকর ও হিতকর সে বিষয় বৈধ করে : সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং যাবতীয় অকল্যাণ ও ক্ষতিকর বিষয় পরিহার করতে মানবজাতিকে নির্দেশ করেছে।

মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব; তার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য ইসলাম অন্যের ওপর নির্ভরশীল ও বোঝা না হয়ে নিজে কর্মক্ষম হতে উৎসাহ প্রদান করেছে এবং অন্যের কাছে হাত পাততে নিরুৎসাহিত করেছে; নিজের শারীরিক শক্তি কাজে লাগিয়ে তার ব্যক্তিত্ব রক্ষা করুক; নিজের জীবিকার জন্য নিজেই প্রচেষ্টা করুক। কোরআন বলছে : মানুষ যতটুকু চেষ্টা করবে, ততটুকুই পাবে (নজম)। কোনো জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তনে যতক্ষণ সচেষ্ট না হয়, ততক্ষণ আল্লাহ এর অবস্থার পরিবর্তন করেন না (সূরা রাদ : ১১)। একজন মানুষ নিজের মতোই দেহবিশিষ্ট আরেকজন মানুষের কাছে হাত পাতবে কিংবা ভিক্ষা করবে- এর মতো লাঞ্ছনা আর হয় না।

তাই আল্লাহ তাআলা শুধু পৃথিবীই নয়; বরং সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন মানুষের কল্যাণের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন :

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا ۚ ثُمَّ اسْتَوٰۤی اِلَی السَّمَآءِ فَسَوّٰىهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ؕ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿۲۹﴾

'তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের (মানুষের) জন্য সৃষ্টি করেছেন; তারপর তিনি আকাশের দিকে মনঃসংযোগ করেন এবং তাকে (আকাশকে) সাত আকাশে বিন্যস্ত করেছেন; তিনি সব বিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (সূরা বাকারা : আয়াত ২৯)

ইসলামে আত্মনির্ভরশীলতার গুরুত্ব :

ইসলাম জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীলতাকে পরিহার এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টাকে ইবাদত বলে গণ্য করে। ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে : 'হালাল পন্থায় জীবিকা তালাশ করা ফরজ ইবাদতের পর আরেকটি ফরজ ইবাদত।' তাই তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষকে শারীরিক সক্ষমতা দান করার পাশাপাশি জীবিকা তালাশের জন্য অসংখ্য উপায়-উপকরণও দিয়ে রেখেছেন। মূলত মানুষের জীবিকা আল্লাহ সৃষ্টি করেই রেখেছেন। মানুষ শুধু একটু প্রচেষ্টা, পরিশ্রম আর কৌশলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নির্দেশিত পন্থায় সেগুলো ব্যবহার করবে। এটাই তার দায়িত্ব।

ইচ্ছাশক্তি ও শ্রমশক্তির মাধ্যমে সম্মান, সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জন করতে আত্মনির্ভরশীলতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। আত্মনির্ভরশীলতা থেকেই আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়। আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও জাতির মৃত্যু নেই। তারা কোনো দিন অধঃপতিত ও নিশ্চিহ্ন হয় না কিংবা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যায় না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনো জাতির ভাগ্য বা অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। আল্লাহ পাক আরও বলেছেন, মানুষ নিজেদেরই চেষ্টার ফল লাভ করে।

দুর্বল মন-মানসিকতা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হওয়ার বিরাট অন্তরায়। তাই নিজেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়ার বাস্তবসম্মত প্রচেষ্টা নিয়ে কাজ করা উচিত। আলস্য, অপব্যয়, অপচয়, অশিক্ষা-কুশিক্ষা এবং অন্যের কাছে ধরণা দেওয়ার প্রবণতার কারণে সত্যিকার আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মন-মানসিকতা ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে পরনির্ভরশীল হয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত নিয়ামতরাজির সঠিক ব্যবহার :

মানুষকে মহান আল্লাহ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তাদের যাবতীয় মৌলিক অধিকারও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে

দিয়েছেন। সে লক্ষ্যে তিনি সব সৃষ্টিকে মানুষের সেবায় নিয়োজিত করেছেন এবং আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলের সমস্ত কল্যাণ লাভ করার ও ব্যবহারের জন্য এ সব কিছুকে মানুষের আয়ত্তে ও নিয়ন্ত্রনে করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ ﴿۱۵﴾

"তিনিই তো তোমাদের জন্য যমিনকে সুগম করে দিয়েছেন, কাজেই তোমরা এর পথে-প্রান্তরে বিচরণ করো এবং তাঁর রিযিক থেকে তোমরা আহার করো। আর তাঁর নিকটই পুনরুত্থান।" [সূরা আল-মুলক : ১৫]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেন :

اَللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ﴿۳۲﴾

তিনিই আল্লাহ যিনি আকাশ মণ্ডলী ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্বারা জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন। নৌযানকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তাঁর বিধানে তা সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। [সূরা ইবরাহিম : ৩২]

তিনি আরও ইরশাদ করেন :

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۳﴾

তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন আকাশমণ্ডলী ও ভূমণ্ডলীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে; চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে রয়েছে নির্দশন। [সূরা জাসিয়াহ : ১৩]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

فَلْیَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰی طَعَامِهٖۤ ﴿۲۴﴾ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ﴿۲۵﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿۲۶﴾ فَاَنْۢبَتْنَا فِیْهَا حَبًّا ﴿۲۷﴾ وَّ عِنَبًا وَّ قَضْبًا ﴿۲۸﴾ وَّ زَیْتُوْنًا وَّ نَخْلًا ﴿۲۹﴾ وَّ حَدَآىِٕقَ غُلْبًا ﴿۳۰﴾ وَّ فَاكِهَةً وَّ اَبًّا ﴿۳۱﴾ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَ لِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾

"মানুষের কর্তব্য তার খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া; চিন্তা করা। আমিই বৃষ্টি বর্ষণ করি, পরে জমিকে বিস্ময়করভাবে বিদীর্ণ করি। আর তাতে শস্য, আঙুর, শাক-সবজি, তরি-তরকারি, যয়তুন, খেজুর, বিশিষ্ট উদ্যানসমূহ, ফল এবং গবাদি-খাদ্য উৎপাদন করি– তোমাদের ও তোমাদের পশুর ভোগের জন্য।" [সূরা আবাসা : ২৪-৩২]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَابْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ۝۷۷

"আর আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন তাতে তুমি আখিরাতের নিবাস অনুসন্ধান কর। তবে তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না। তোমার প্রতি আল্লাহ যেরূপ অনুগ্রহ করেছেন তুমিও (সৃষ্টির প্রতি) সেরূপ অনুগ্রহ কর। আর যমীনে ফাসাদ করতে চেয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ ফাসাদকারীদের ভালবাসেন না।" [সূরা আল-ক্বাছাছ: ৭৭]

অন্যত্র আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا مِنْ دَاۗبَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۭ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝۶

'আর পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই সুবিন্যস্ত এক কিতাবে রয়েছে।' (সূরা হূদ : ৬)

আলো-বাতাস, পাহাড়–পর্বত, বন-জঙ্গল, নদী-নালা, সাগর-মহাসাগর, সমভূমি-মরুভূমি সর্বত্র মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টজীবের জীবিকার অসীম উপকরণ রেখে দিয়েছেন– যা কিয়ামত পর্যন্ত নিঃশেষিত হবে না। আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তার সহজসাধ্যতার উপায়– উপকরণের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যেন মানুষ তা আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। আর এ পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে- ছিটিয়ে থাকা আল্লাহ তা'আলার এ নিয়ামত যে ব্যক্তি বা জাতি নিয়মিত ও পরিমিতভাবে আহরণ করতে পারে, সে ব্যক্তি বা জাতি তো সমৃদ্ধিশালী হবেই।

স্রষ্টা প্রদত্ত শক্তি সামর্থের উপর আস্থাশীলতার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন :

মানবদেহের জীবনীশক্তি জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এর জন্য প্রয়োজন মেধা, শ্রম ও সময়ের যথোপযুক্ত ব্যবহার। তাই ইসলাম স্বনির্ভরতা অর্জনে উৎসাহিত করে পরনির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছে। হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানবতাকে হীনতম অবস্থা থেকে সম্মানজনক অবস্থায় সমাসীন করার লক্ষ্যে ভিক্ষুকের হাতকে কর্মের হাতে পরিণত করার বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বহুল প্রসিদ্ধ ঘটনা ভিক্ষুকের শেষ সম্বল কম্বল বিক্রয় করে কুড়াল ক্রয় করে দিয়ে স্বনির্ভরতার দীক্ষা প্রদান করেছেন। বস্তুত পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে স্বাবলম্বিতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের যথার্থ দিক নির্দেশনা রয়েছে। মুসলিম জাতিকে হীন মানসিকতা ও দুর্দশা থেকে মুক্তির নিমিত্তে এ বিষয়ে জ্ঞানার্জনে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

কারণ পরনির্ভরশীলতা বিশ্বমানবতার জন্য অভিশাপ। এটা মানবতাকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারে। সম্পদহীন ব্যক্তির যেমন কোনো শক্তি, মান-মর্যাদা থাকে না তেমনি পরনির্ভরশীল জাতিও বিশ্বের জাতি সমূহের সামনে সম্মান-মর্যাদা থেকে হয় বঞ্চিত। এ বঞ্চনা ও অবমাননা হতে মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামে রয়েছে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। প্রিয় নবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রেখে গেছেন বিশ্ববাসীর সামনে উজ্জ্বল এক শিক্ষা ও আর্দশ। নিম্নে স্বর্নিভরতা অর্জনে ইসলামের দিক নির্দেশনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

হালাল উপার্জনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন :

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, মানুষের মৌলিক অধিকার। এগুলোর যোগান দিতে মানুষকে বেছে নিতে হয় সম্পদ উপার্জনের নানাবিধ পন্থা; জীবিকা নির্বাহের জন্য মানুষ যেসব পেশা অবলম্বন করে তা হলো : কৃষি, ব্যাবসা-বানিজ্য, চাকুরি, শিল্প প্রভৃতি। উপার্জনের মাধ্যম ব্যতীত কোন ব্যক্তির পক্ষেই উপর্যুক্ত মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়।

মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। এটি শুধু পাঁচ ওয়াক্ত নামায, রোযা, যাকাত প্রভৃতির উপরই সীমাবদ্ধ নয়। জীবন ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ-রেখার প্রণেতা হিসেবে ইসলামে রয়েছে জীবন ধারণের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা। শুধু তা-ই নয়, ইসলাম

এটিকে অত্যাবশ্যক (ফরয) কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ মর্মে হযরত রাসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস প্রনিধানযোগ্য। তিনি ইরশাদ করেন :

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

"ফরয আদায়ের পর হালাল পন্থায় উপার্জনও ফরয।" (শু'আবুল ঈমান ৮৩৬৭, সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি ১১৬৯৫)

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর নির্ধারিত ফরয ইবাদত (যেমন নামায) সম্পন্ন করার পর জীবিকা অন্বেষণে জমিনে ছড়িয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ জীব নিজেই জীবিকা অর্জনে ব্রতী হয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

'অতঃপর যখন নামায শেষ হবে, তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো, আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ করো এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সূরা জুমু'আ : ১০)।

হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পরিশ্রমলব্ধ উপার্জনকে সর্বোত্তম উপার্জন বলে আখ্যায়িত করেছেন; ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ

'নিজের উপার্জিত আহার সর্বোত্তম। তোমাদের সন্তানও নিজ উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।' (ইবনে মাজাহ হা/১৭৩৮, ২১২৮; মিশকাত হা/২৭৭০; ইরওয়াউল গালিল ৬/৬৬, হাদিস সহিহ)

আরেকটি হাদিস শরিফে এসেছে,

عن سعيد بن عمير عن عمه قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ كَسْبٍ مَبْرُوْرٍ

হযরত সাঈদ ইবনে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর চাচা হতে বর্ণনা করেন : তিনি বলেন, হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করা হল, কোন প্রকার উপার্জন উত্তম। তিনি ইরশাদ করেন, 'হাতের কাজ এবং হালাল উপার্জন।' (সহিহ আত-তারগিব ওয়াত তারহিব হা/১৬৮৮)

সম্মানিত নবী-রাসুলগণের মধ্যে প্রায় সকলেরই পেশা ছিল :

হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম মাদইয়ানে ৮ বছর কাজ করছেন, হযরত নুহ আলাইহিস্ সালাম জাহাজ নির্মাণ করেছেন। হযরত যাকারিয়া আলাইহিস্ সালাম কাঠশিল্পে আত্মনিয়োগ করেছেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাবসা করেছেন, চাকরি করেছেন, খন্দকের যুদ্ধে মাটি কেটেছেন, মাথায় বোঝা বহন করেছেন, কূপ থেকে পানি তুলেছেন, নিজ হাত মুবারকে স্বীয় জামা ও জুতা মুবারক সেলাই করেছেন, স্ত্রীবর্গকে ঘরে রান্নার কাজে সাহায্য করেছেন, এমনকি দুধ দোহনও করেছেন। তা ছাড়া অধিকাংশ নবিই শিল্পকাজে জড়িত ছিলেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْۢ بَاْسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ﴿٨٠﴾

"আমি তাঁকে (দাউদ আলাইহিস্ সালাম) বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তা যুদ্ধে তোমাদের রক্ষা করে।" [সূরা আম্বিয়া : ৮০]

হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

'নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেউ কখনও খায়নি। আল্লাহ্র নবি হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্য খেতেন।' (বুখারী, হা/৫৪৪; মিশকাত হা/২৭৫৯)

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ﴿١٠﴾

اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ؕ اِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١﴾

'আর আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই মর্মে যে, 'হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো, হে পক্ষীকুল, তোমরাও তা-ই করো। আমি তার জন্য লৌহকে নরম করেছিলাম এবং তাঁকে বলেছিলাম, প্রশস্ত বর্ম তৈরি করো, কড়াসমূহ যথাযথভাবে সংযুক্ত কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর। তোমরা যা কিছু করো, আমি তা দেখি।' (সূরা সাবা : ১০-১১)।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا وَ لَا تُخَاطِبْنِيْ فِي الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ۚ اِنَّهُمْ مُّغْرَقُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ ۖ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ ؕ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوْا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُوْنَ ﴿٣٨﴾

আর আপনি আমার সম্মুখে আমারই নির্দেশ মোতাবেক একটি নৌকা তৈরি করুন এবং পাপিষ্ঠদের ব্যাপারে আমাকে কোনো কথা বলবেন না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। তিনি নৌকা তৈরী করতে লাগলেন; আর তাঁর কওমের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন পার্শ দিয়ে যেত, তখন তাঁকে বিদ্রুপ করত। তিনি বললেন, তোমরা যদি আমাদের উপহাস করে থাকো, তবে তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রুপ তোমাদের উপহাসের জবাব দেবো। (সূরা হুদ : ৩৭-৩৮)

হযরত ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) ও হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) ছিলেন স্থপতি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهٖمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ اِسْمٰعِيْلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٢٧﴾

স্মরণ করুন, যখন হযরত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) ও হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) কাবাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল : পরওয়ারদেগার, আমাদের থেকে কবুল করো। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (সূরা বাকারা : ১২৭)

হযরত ইলিয়াস আলাইহিস্ সালাম ছিলেন পোশাক শিল্পে পারদর্শী। হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম পশুচারণ করতেন; আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ مَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ﴿١٧﴾ قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ اَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَ اَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِيْ وَ لِيَ فِيْهَا مَاٰرِبُ اُخْرٰى ﴿١٨﴾

হে মুসা, তোমার ডানহাতে ওটা কি? তিনি বললেন : এটা আমার লাঠি, আমি এর উপর ভর দিই এবং এর দ্বারা ছাগপালের জন্যে বৃক্ষপত্র ঝেড়ে ফেলি এবং এতে আমার অন্যান্য কাজও চলে। (সূরা ত্বাহা : ১৭-১৮)

হযরত ইসা আলাইহিস্ সালাম ছিলেন চিকিৎসক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَ رَسُوْلًا اِلٰى بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۙ اَنِّيْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۙ اَنِّيْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ اُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَ مَا تَدَّخِرُوْنَ ۙ فِيْ بُيُوْتِكُمْ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۴۹﴾

আর বণি ইসরাঈলদের জন্যে রসুল হিসেবে তাকে মনোনীত করবেন। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে। আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখির আকৃতি তৈরী করে দিই। তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখিতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে। আর আমি জীবিত করে দিই মৃতকে আল্লাহ্‌র হুকুমে। আর আমি তোমাদের বলে দিই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস। এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (সূরা আলে ইমরান : ৪৯)

এ আকাশ-বাতাস, বন-জঙ্গল, পাহাড়–পর্বত, সাগর-মহাসাগর, মাটি-বালি ও তার তলদেশে মহান আল্লাহ তাআলা যে সম্পদ সৃষ্টি করে রেখেছেন, তার সদ্ব্যবহারের জন্য শিল্পোন্নয়ন জরুরি। শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ সমৃদ্ধি ছাড়া জাতীয় আয়বৃদ্ধি করা যায় না। শিল্প শিক্ষাকে মহান আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এজন্য শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ্‌র নবিগণ কোনো না কোনো শিল্পকর্মে নিয়োজিত ছিলেন। উপরোক্ত আয়াতে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম বর্ম শিল্পে নিয়োজিত ছিলেন বলে আভাস রয়েছে। এ ছাড়াও তিনি প্রথম জীবনে চাষাবাদ করেছেন। তিনি শস্য বপন ও কর্তন করতেন। হযরত সোলাইমান আলাইহিস্ সালামের উঁচু উঁচু প্রাসাদ, বড়ো বড়ো পানি সঞ্চয় পাত্র ইত্যাদি তৈরি করার বর্ণনা পাওয়া যায়।

মহানবি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

مثَلُ الصانِعِ الَّذي يَعملُ ويَحتسبُ في صَنعتِهِ الخيرَ كمَثَلِ أمِّ مُوسَى تُرضِعُ ولدَهَا وتأْخُذُ أجْرَهَا

"যে জমি মানুষের খিদমতের জন্য কোনো কাজ করে তাঁর দৃষ্টান্ত হযরত মুসা আলাইহিস্ সালামের জননীর ন্যায়। তিনি নিজে সন্তানকে দুধ পান করিয়েছেন; আবার ফেরাউনের কাছ থেকে পারিশ্রমিক পেয়েছেন।

এজন্য পেশা ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। নিজে পরিশ্রম করে শ্রমলব্ধ আয়ে নিজের পরিবারবর্গের আস্বাদনের জন্য সংগ্রাম করা অতিশয় সম্মান ও পুণ্যের কাজ।

পরনির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ইসলামের নিন্দা ও ঘৃণা :

ইসলাম অপরের উপর নির্ভর করে জীবন পরিচালনার বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেছে এবং ভিক্ষাবৃত্তির প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা প্রদর্শনপূর্বক কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এ মর্মে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বদা মানুষের কাছে চেয়ে বেড়ায় সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আগমন করবে যে, তার মুখমণ্ডলে এক টুকরো গোশতও থাকবে না।" (ইমাম বুখারি, সহিহ, খণ্ড ২, হাদিস নং ১৪৭৪)

এ প্রসঙ্গে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন,

من سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ

'যে ব্যক্তি অভাব ব্যতীত ভিক্ষা করলো; সে যেন জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করলো।" (মুসনাদে আহমদ : ৫১)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

من سَأَلَ الناس وَله مَا يُغْنِيه جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة ومسألته فِي وَجهه خموش أَو خدوش أَو كدوح، قيل: يَا رَسُول الله وَمَا يُغْنِيه؟ قَالَ: خَمْسُونَ درهما أَو قيمتهَا من الذَّهَب

'ভিক্ষাবৃত্তি ক্ষত স্বরূপ; এর দ্বারা ভিক্ষুক মুখমণ্ডলকে ক্ষত-বিক্ষত করে।' (সুনানে নাসায়ি : ৯৮)

অন্য হাদিসে নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا، فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ

'যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনে ভিক্ষা করে, সে হাতে অঙ্গার রাখার মতো ভয়াবহ কাজ করে।' (বায়হাকি : ৬৩৪)

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عَنْ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ ، وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ قال : قُلْتُ : أَنَا. قَالَ : لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا. - وفي رواية : مَنْ يَضْمَنُ لِي وَاحِدَةً ، وَأَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : لاَ تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا.

'যে ব্যক্তি এইমর্মে প্রতিশ্রুতি দিবে যে, সে অন্যের কাছে হাত পাতবে না। আমি তার জান্নাতের জিম্মাদারি গ্রহণ করবো।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৫৮৮)

হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

لَأَنْ يَغْدُوَ أحَدُكم فَيَحْتَطِبَ على ظَهرِهِ ، فيَتَصَدَّقَ مِنهُ ، و يَسْتَغْنِي به عنِ النَّاسِ ، خَيرٌ له من أنْ يَسألَ رَجُلًا ، أعطاهُ أو مَنَعهُ ، ذَلكَ بِأنَّ اليَدَ العُلْيَا ، أفضَلُ من اليدِ السُّفْلَى ، و ابْدأْ بِمنْ تَعُولُ

"তোমাদের কেউ তার রশি নিয়ে চলে যাক, পিঠে কাঠের বোঝা বহন করে এনে বিক্রয় করুক এবং তার চেহারাকে আল্লাহ্‌র আযাব থেকে বাঁচিয়ে রাখুক এটা তার জন্য মানুষের নিকট ভিক্ষা করা; চাই তাকে দান করুক বা না করুক তার চাইতে উত্তম।" (বুখারী-২০৭৪, মুসলিম-১০৪২)

অতএব, উপার্জন করার মনোবৃত্তি ব্যতিরেকে যারা ভিক্ষাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় তাদের এ ধরনের পেশাকে অবৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে।

পরনির্ভরশীলতা ও ভিক্ষাবৃত্তির মূলোৎপাটনে সুদমুক্ত ঋণপ্রদানের প্রতি ইসলামের উৎসাহ প্রদান :

দরিদ্র ও পরনির্ভরশীল মানুষকে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য করজে হাসানাহ্ বা সুদ মুক্ত ঋণ দান অতি উত্তম একটি পন্থা। এ কারণে ইসলামি শরিয়ত দরিদ্র অসহায়, নিঃস্ব, অভাবী মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে ঋণ প্রদানকে সম্পদশালী ও ধনীব্যক্তিদের উপর ওয়াজিব ঘোষণা করেছে। যাতে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রীতি, ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং দায়িত্বানুভূতি বিকশিত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ

তোমরা আল্লাহকে করজে হাসানাহ্ (উত্তম ঋণ) দাও। [সূরা মুয্‌যাম্মিল: ২০]

অন্য আয়াতে অভাবী নিঃস্ব পীড়িতকে ঋণদান প্রকারান্তরে আল্লাহকে ঋণ প্রদান হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

مَنْ ذَا الَّذِیْ یُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَیُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِیْرَةً ؕ

যে আল্লাহকে উত্তমরূপে ঋণ (সুদমুক্ত) প্রদান করবে, আল্লাহ তার সেই দানকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে (কিয়ামতের দিন পুরস্কার হিসেবে) দিবেন। [সূরা বাকারাহ : ২৪৫]

স্বনির্ভরতা অর্জনে দানশীলতার প্রতি উৎসাহ :

স্বনির্ভরতা অর্জনে দানশীলতার সুদুরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। এ কারণে হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দানশীলতা বিকাশে উৎসাহ প্রদানের পাশাপাশি কৃপণাতাকে নিকৃষ্ট মানসিক রোগ বলে চিহ্নিত করেছেন। প্রয়োজনাতিরিক্ত সবকিছু দান করে দেওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র আল-কুরআনে এ দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, কি ব্যয় করবে? বলে দিন উদ্‌বৃত সবকিছু।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَ فِیْۤ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَ الْمَحْرُوْمِ ﴿۱۹﴾

অর্থাৎ তোমাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিত জনের অধিকার রয়েছে। [সূরা যারিয়াত : ১৯]

হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবিরা দানশীলতার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যকার দারিদ্র্য দূরীকরণে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

স্বনির্ভরতা অর্জনে মিতব্যয়ীতার প্রতি উৎসাহ :

অপরিমিত সম্পদ ব্যয় পরনির্ভশীলতার অন্যতম প্রধান কারণ। হযরত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই সম্পদ ব্যয়ে মিতাচারী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা অপব্যয় করতে নিষেধ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَ اٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَ الْمِسْكِیْنَ وَ ابْنَ السَّبِیْلِ وَ لَا تُبَذِّرْ تَبْذِیْرًا ﴿۲۶﴾ اِنَّ الْمُبَذِّرِیْنَ كَانُوْۤا اِخْوَانَ الشَّیٰطِیْنِ ﴿۲۷﴾

"প্রাপ্য দেবে আত্মীয়-স্বজন, মিসকিন ও মুসাফিরদেরকে কিন্তু কিছুতেই অপব্যয় করবে না। অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই।" [সূরা বণি ইসরাঈল : ২৬-২৭]

ব্যয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা মধ্যম পন্থাবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

আর যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। [সূরা ফোরক্বান : ৬৭] তাই বলা যায়, স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য অপব্যয় না করা ও মিতব্যয়ী হওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন।

আমাদের উচিত : কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত এ সব নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে এ সব মাধ্যম ব্যবহার করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জীবিকা অন্বেষণের পথ খুঁজে বের করি; অন্যের ওপর নির্ভর করে অন্যের বোঝা না হই। আমরা যেন আমাদের ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিকভাবে সারাবিশ্বে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারি এবং বিশ্ব দরবারে স্বাবলম্বী জাতি হিসেবে আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পারি। এই কামনা করছি।

লেখক :
বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
সাদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ,
খতিব, মুসাফির খানা জামে মসজিদ, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম।
e-mail: jalal_cairo@yahoo.com

‘ফানা আনিল খাল্ক’ এর আলোকে পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন ও সৎ-রুজি অর্জন

✍ ড. মুহাম্মদ ইছমাইল নোমানী

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব (আশরাফুল মাখলূকাত)। সে শ্রেষ্ঠত্ব শুধু সৃষ্টিগত কারণে নয়; বরং তার মধ্যে যে মানবতা রয়েছে তার কারণে। সৃষ্টিলগ্নে সে মানুষ হায়ওয়ানে নাত্বিক বা বাকপটু সম্পন্ন প্রাণী। তার মধ্যে যে প্রাণিত্ব বা পশুত্ব রয়েছে তা দমন করার মাধ্যমে সে প্রকৃত মানুষ বা মানবতা সম্পন্ন সৃষ্টিতে পরিণত হয়। পশুসুলভ আচরণকে বিনাশ করে স্রষ্টার সাথে মিলতে পারলে সে অমরত্ব লাভ করে। সে পদ্ধতির নাম হলো ফানা-বাকা। আর ‘ফানা আনিল খল্ক’ হলো ‘আত্মশুদ্ধির সপ্তকর্ম পদ্ধতি’ الاصول السبعة এর একটি। তা তরিকতের একটি পরিভাষায়; যা আধ্যাত্মিক মহান সাধক হযরত গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী আল্লামা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কাদেরী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তন করেছেন। হযরত দাতাগঞ্জ বখ্শ আলি হাজবিরি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর মতে, তরিকতের পরিভাষায় ফানা-বাকা পরস্পর সম্পূরক। মূলত; তাসাউফে ফানা-বাকা শব্দটি সামনে এনেছেন বা পরিচিত করেছেন হযরত আবু সাঈদ খারবায (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)। ফানা অর্থ নিজ সত্ত্বাকে বিলীন করে দেওয়া। যেমন হযরত কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) আল্লাহ্র সান্নিধ্য লাভ করার জন্য নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করে বারো বছর সাধনা করেছেন। জঙ্গলে কঠোর সাধনার পর বাড়িতে ফিরে এলে তাঁর সম্মানিত মাতা তাঁর চুল ধরে টান দিয়ে পরীক্ষা করলেন। চুল ধরে টানার পর ‘উহ’! শব্দ বলতেই মা বললেন, এখনও তো তোমার আত্মানুভূতি আছে। তোমার সাধনা সফল হয়নি। এ কথা শুনে আবারও সাধনা করতে জঙ্গলে চলে গেলেন। আরও বারো বছর সাধনার পর ফিরে এলে এবার মা পরীক্ষা করলেন, খাবারের এক পাশে চুন দিয়ে। তিনি দই মনে করে তা খেয়ে ফেললে মা বললেন, এবার তোমার সাধনা কামিয়াব হয়েছে। তোমার জিহ্বায় স্বাদ নেই। ঘটনাটি নিজাম উদ্দীন আউলিয়া

মাহবুবে ইলাহি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)-র বর্ণনা। (সূত্র : মুশতাক আহমদ নিজামি, খুতবাতে নিজামি, পৃষ্ঠা ২০৭)। এ ধরনের নিজ অস্তিত্ব বিলীন করে আল্লাহ্‌র সাথে মিলে যাওয়াই হলো 'ফানা আনিল খল্‌ক'। পৃথিবী ও তন্মধ্যে যা আছে সবকিছু ফানা বা ধ্বংসশীল। পক্ষান্তরে পরকাল ও তৎসম্পর্কিত যা কিছু আছে তা বাকা বা স্থায়ী। তাই হযরত ইব্রাহিম শিবানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, ফানা-বাকার ইল্‌মের কেন্দ্রবিন্দু আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সাথে নিরেট একত্ববাদের হয়ে সঠিক ইবাদত করা। কাজেই ফানা'র সর্বোচ্চ সীমা মৃত্যু, তা না পরকালে থাকবে, না দোযখে; না বেহেশতে। তাই আল্লাহ্‌র ঘোষণা :

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾

(পরকাল উত্তম ও চিরস্থায়ী)। (সূরা আল আ'লা : ১৭।)

বুখারি শরিফে উল্লেখিত হাদিসে নববির ভাষ্য মতে জান্নাতিদের বলা হবে : হে জান্নাতিরা, জান্নাতে মৃত্যু নেই। এতে তারা আনন্দিত হবে। আর দোযখীদের সম্বোধন করে বলা হবে- হে দোযখিরা, নরকে মৃত্যু নেই। তখন তারা কান্নায় ভেঙে পড়বে। দুঃখ, বেদনা আরও বৃদ্ধি পাবে। 'ফানা আনিল খাল্‌ক' এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষ ধ্বংসশীল পার্থিব এ বিষয়বস্তু থেকে অনাসক্ত হয়ে মন-প্রাণ ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা অবিনশ্বর সত্তার প্রতি আসক্ত থাকা। পার্থিব বস্তুর মধ্যে একটি হলো পরমুখাপেক্ষীতা। বান্দা আল্লাহ্‌র প্রতি হবে মুহতাজ বা মুখাপেক্ষী আর অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষি হওয়া আল্লাহ পছন্দ করেন না। তাই নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

ومن يستعفف يعفه الله و من يستغن يغنه الله

যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পাক-পবিত্র রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষিতা চায় তিনি তাকে অমুখাপেক্ষিতা দান করেন। (সহিহ মুসলিম : যাকাত পর্ব।)

হালাল উপার্জন বা সৎ-রুজি অর্জন মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মর্মে হযরত রাসূল পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন-

ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه

মানুষ যা কিছু নিজ উপার্জন থেকে ভোগ করে তা-ই উত্তম। (নাসাই শরিফ : কিতাবুল বুয়ূ)

অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুসলিম দার্শনিক ইমাম গাযালী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বর্ণনা করেছেন : একদা নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মসজিদে নববিতে সাহাবা কিরামসহ উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক যুবক ভোরে তাদের পার্শ দিয়ে উপার্জনের উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে। সাহাবিগণ বললেন : আফসোস, এই যুবক যদি আল্লাহ্‌র পথে ছুটে যেতো। নবি করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : এভাবে বলো না। কেননা এই ব্যক্তি যদি নিজেকে বা মাতা-পিতা বা নিজের স্ত্রী পুত্রকে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে রক্ষার উদ্দেশ্যে গমন করে থাকে তা হলে সে আল্লাহ্‌র পথে আছে। যদি বাহাদূরি, অহংকার ও অতিরিক্ত ধনার্জনের উদ্দেশ্যে গমন করে তাহলে সে শয়তানের সাথে রয়েছে। (ইমাম গাযালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি), (কিমিয়ায়ে সা'আদাত।)

হযরত গাউছুল আযম আব্দুল কাদির জিলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর আব্বাজান হযরত সৈয়দ আবু সালেহ মুছা জঙ্গি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) অতি উঁচু স্তরের অলি ছিলেন। জঙ্গলে ইবাদত করতেন। হযরত আবু ছালেহ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এক নদীর কিনারায় একটি আপেল দেখে খেয়ে ফেললেন। মালিকের অনুমতি ছাড়া তা খাওয়াতে আফসোস করতে লাগলেন। যেতে যেতে নদীর কিনারায় একটি আপেলের শাখা আছে দেখে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন মালিকের নাম সৈয়দ আব্দুল্লাহ সাওমাঈ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)। তিনি ক্ষমা চাইলেন ; অথচ কুঁড়িয়ে পাওয়া জিনিস নগণ্য হলে তা হালাল। তারপরও আত্মশুদ্ধি অর্জনের কারণে পিওর খাদ্য নয় মনে করে তিনি চিন্তিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। মালিকের নিকট ক্ষমা চাইলে বললেন : আমার মেয়ে অন্ধ, খোঁড়া ও বধির ; তাকে বিয়ে করতে হবে। যেহেতু বেগানা পুরুষকে দেখেনি তাই অন্ধ। অন্যায় কাজে যায়নি খোঁড়া, অশ্লীল কথা বলেনি বা শুনেনি বধির। সে ঘরে সৈয়দা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) এর শেকমে জন্মগ্রহণ করেন গাউছে ছামদানি, নুরে ইয়াজদানি গাউছে পাক আব্দুল কাদির জিলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি)। তিনি কেমন মর্যাদাবান! (মাযহারে জামালে মোস্তফায়ি)

পরমুখাপেক্ষিতা বর্জন ও সৎ-রুজি অর্জনের জন্য বান্দা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আদিষ্ট। তা পালন আল্লাহ্‌র আনুগত হওয়া বোঝায়। মূলত; 'ফানা আনিল খল্‌ক' হচ্ছে মানুষ নিজের আত্মস্থিত মূর্খতা, অলসতা, প্রবৃত্তি ও নাফরমানিকে বিলীন করে আল্লাহ্‌র অনুগত থেকে হালাল রোজগার খেয়ে

তাঁরই ইবাদত করা। হাদিসের ভাষ্য মতে-যার পেটে হারাম রোজগার প্রবেশ করবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার ইবাদত কবুল হবে না। হারাম রোজগার যখন তার পেটে প্রবেশ করে, তার থেকে রক্ত এবং রক্ত থেকে মাংস সৃষ্টি হয়-যা অপবিত্র ও ময়লা। নাপাক বস্তুর স্থান স্বর্গে হবে না। তাই সে হারাম রোজগার ভক্ষণকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। তাই আমাদের উচিত হারাম রিযিক থেকে বিরত থাকা আর সৎ-রুজি বা হালাল রুজি অর্জন করা। আল্লাহ আমাদেরকে সৎ-রুজি অর্জন ও পরমুখাপেক্ষীতা বর্জন করার তৌফিক দান করুন। আ-মি-ন!

লেখক :
অধ্যক্ষ
আল আমিন বারীয়া কামিল মডেল মাদরাসা
বাহির সিগন্যাল, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

আত্মশুদ্ধি অর্জনে 'ফানা আনিল এরাদা'-র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য

✍ মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

মানব জাতি আল্লাহ্‌র সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের লক্ষ্যে তাকে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত কুরআন ও সুন্নাহ-র আলোকে বিধি-বিধান পালন করতে হয়। এ লক্ষ্যে যুগে যুগে মানবজাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ্‌র অলীগণ হিদায়াতের বাণী ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। তাঁদের প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণে মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য এবং মুক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, তাঁদের নির্দেশনার প্রতি উপেক্ষা অসম্মান ও অশ্রদ্ধা এবং গুরুত্বহীন মনে করা যাবতীয় অশান্তি এবং দুনিয়া আখিরাতের সামগ্রিক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার অন্যতম কারণ।

শিরোনামে উল্লিখিত 'ফানা আনিল এরাদা' তরিকতের একটি পরিভাষা। উপমহাদেশের প্রখ্যাত অলিয়ে কামিল গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ)'-এর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী, অলিয়ে কামিল হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রণীত "*বেলায়তে মোত্‌লাকা*" গ্রন্থটি নবুয়ত, বেলায়ত, গাউছিয়ত, কুতুবিয়ত, তরিকত, দর্শন, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, কোরবানি ও হালাল হারামসহ তরিকত সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ে লিখিত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এ গ্রন্থের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের ১০৭ পৃষ্টায় তরিকত জগতে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন সাধনে "ফানায়ে ছালাছা" অর্থাৎ (১) ফানা আনিল খালক, (২) ফানা আনিল হাওয়া, (৩) ফানা আনিল এরাদা ত্রিবিধ তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন।

উক্ত ত্রিবিধ পদ্ধতির শেষোক্ত "ফানা আনিল এরাদা" বিষয়ে কুরআন সুন্নাহ-র আলোকে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করার লক্ষ্যে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তিনি "ফানা আনিল এরাদা" র সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন "নিজের ইচ্ছার উপর খোদার ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেওয়া অর্থাৎ খোদার ইচ্ছাতে নিজের ইচ্ছাকে বিলীন করিয়া দেওয়া। একে 'ফানা আনিল এরাদা' বলে; সুফি পরিভাষায় রজা এবং তাসলীম বলা হয়।

(তথ্যসূত্র : বেলায়তে মোত্লাকা. পৃ: ১০৭ মূলতত্ত্ব বা তজকিয়ায়ে মোখতাছার প্রথম খণ্ড পৃ: ২৯ বিশ্ব-মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ পৃ: ০৭)

কুরআন সুন্নাহ-র আলোকে তাকওয়া ভিত্তিক জীবন গঠন আল্লাহ ও তদীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি অর্জনে উপরি-উক্ত বাণীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

অভিশপ্ত শয়তান মানব জাতিকে গুমরাহ তথা পথভ্রষ্ট করার জন্য সদা তৎপর। বান্দাকে নামায, রোজা, হজ্ব যাকাত, উত্তম আমল থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তানি তৎপরতা বান্দাকে সদা সর্বদা প্ররোচিত করে যাচ্ছে। ইমান রক্ষার কঠিন এই অগ্নি পরীক্ষায় মু'মিন বান্দারা নিজের কামনা-বাসনা কে বিলীন করে খোদায়ি ইচ্ছা শক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে মূলত নিজেরা জয়যুক্ত হয়, শয়তানকে পরাজিত করে। এ পর্যায়ের সত্যান্বেষী বান্দারাই জান্নাতবাসী। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন :

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ﴿٤٠﴾ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاْوٰى ﴿٤١﴾

অর্থাৎ : আর যে স্বীয় প্রভুর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল। (সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১)

আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী বান্দারাই সফলকাম :

খোদায়ি ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে ধর্মীয় বিধান ও অনুশাসন মেনে চলা। অন্যায়, পাপাচার, মিথ্যাচার, অনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থেকে আধ্যাত্মিক উন্নয়নে দ্বীনি আখলাক অর্জন ও চারিত্রিক গুণাবলি অর্জনে আত্মার উৎকর্ষ সাধনে নিয়োজিত বান্দারাই কৃতকার্য সফলকামি।

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾

অর্থাৎ নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে সেই ব্যক্তি যে শুদ্ধ হয়, এবং তার পালন কর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর সালাত আদায় করে। (সূরা আল আলা, : ১৪-১৫)

আল্লাহ্ র আদিষ্ট বিষয় পালন ও নিষিদ্ধ বিষয় পরিহার করে যারা নিজের জীবন পরিচালিত করেছে। তাদের সাফল্যের কথা বিঘোষিত হয়েছে আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে সেই ব্যক্তি সফলতা অর্জন করতে পেরেছে যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে পেরেছে। আর ঐ ব্যক্তি ব্যর্থ হয়েছে যে নিজেকে কলুষিত করেছে। (সূরা আশ্-শামস : ৯-১০)

আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণকারী বান্দারা ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছে।

শয়তানি প্ররোচনা ও নানাবিধ বাধা বিপত্তি কটূক্তি সমালোচনা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যারা দ্বীনি আখলাক ধারণ করে রেখেছে; আল্লাহ ও তদীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে সমুন্নত রেখেছে; ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শ বাস্তবায়ন ও সমুন্নত রাখতে নিষ্ঠাপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কুরআন সুন্নাহ্র আদর্শকে সর্বাগ্রে প্রাধান্য দিয়েছে। পার্থিব স্বার্থ লোভ লালসা কামনা বাসনাকে তুচ্ছ মনে করেছে; আল্লাহ ও তার রাসুলের ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জন ও পরকালীন সাফল্য অর্জনকে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য মনে করেছে, তারাই প্রকৃত মু'মিন ঈমানের স্বাদ তারাই উপভোগ করেছে। হাদিস শরিফে এরশাদ হয়েছে :

হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত : তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এরশাদ করতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করেছে, সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ উপভোগ করেছে। (বুখারি শরিফ)

নিজের ইচ্ছা বিলীন করে আল্লাহ্র আনুগত্যকে প্রাধান্য দিতে হবে।

আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের আনুগত্যের বিরোধিতা করে দ্বীনি আদর্শ উপেক্ষা করে, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কামনা - বাসনা চরিতার্থ করে পার্থিব স্বার্থে

নিজের ইচ্ছায় ধর্মহীন, আদর্শ বিবর্জিত, কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো প্রকার অপতৎপরতাকে সমর্থন করা যাবে না। সুফিয়ায়ে কেরামের ব্যাবহারিক জীবনের আদর্শ অনুসরণ করে আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের আদেশ নিষেধের অনুগত্য করার মধ্যে বান্দার ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্যের সুখময় স্থায়ী জান্নাত বান্দার জন্য প্রস্তুত রয়েছে। জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আদর্শ অনুসরণ ও কুরআন সুন্নাহ-র বিধানকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দিতে হবে, এটাই 'ফানা আনিল এরাদা' এর তাৎপর্য।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ

অর্থাৎ হে মু'মিনগণ, তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমল সমূহ বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ : ৩৩)

আল্লাহ ও তদীয় রাসুলের আনুগত্যকে প্রাধান্য দিলেই আল্লাহ্‌র রহমত প্রাপ্ত হবে। মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসুলের যাতে তোমাদেরকে দয়া করা হয়। (সূরা আলে ইমরান : ১৩২)

মানুষ হলো উন্নয়নের প্রধান মাধ্যম

ইসলাম মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

আমি তো বনি আদমকে মর্যাদা দান করেছি। (সুরা বণি ইসরাঈল : ৭০)

মর্যাদামণ্ডিত ও সম্মানিত এই মানুষকে সৃষ্টি কেন করা হয়েছে ? এই সৃষ্টির কারণ ও খোদায়ি ইচ্ছা অনুধাবন করে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে হবে। মানব সৃষ্টির খোদায়ি ইচ্ছা সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

আমি সৃষ্টি করেছি জিন ও মানুষকে এ জন্য যে তারা আমারই ইবাদত করবে। (সুরা যারিয়াত : ৫৬)

মানবাত্মাকে কলুষমুক্ত করে ইবাদতের মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্যায় অনাচার- অবিচার- জুলুম- নির্যাতন- নগ্নতা- অশ্লীলতা- বেহেয়াপনা ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ দূর করা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য।

মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনে মানুষকেই প্রধান ভূমিকা পালন করতে হবে। কলুষিত সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধীকরণে দুর্নীতিমুক্ত খোদাভীরু আদর্শবান চরিত্রবান মানুষের প্রয়োজন সুন্দর চরিত্র গঠন ও তাকওয়া ভিত্তিক সমাজ গঠনে নিজকে পরিবর্তন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ

"নিশ্চয় আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" (সুরা রা'দ : ১১)

নিজের ইচ্ছা শক্তিকে বিলীন করে গৌরব অহংকার আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে বুজুর্গ কামিল অলিগণের কৃপা দৃষ্টি ও সান্নিধ্য লাভের শরণাপন্ন হলে, তাঁদের সোহবত ও আদর্শ অর্জন করতে পারলে কলুষিত আত্মা পবিত্র হবে। অন্তরে আল্লাহ্‌র যিকিরের ফয়জান জারি হবে। অন্ধকার দূরীভূত হবে। আত্মা পরিশুদ্ধ হবে। কল্‌ব নুরনি হবে। পুণ্যত্মা বান্দাদের শরণাপন্ন হয়ে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ করেছেন।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ

"হে ঈমানদারগণ' আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও।" (সূরা-তাওবা : ১১৯)

অছিয়ে গাউছুল আজমের 'ত্রিবিধ তত্ত্ব' কুরআন সুন্নাহর নির্যাস :

দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের ক্ষেত্র । দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ; পরকালই চিরস্থায়ী ঠিকানা। আমাদের সামগ্রিক অর্জন যেন দুনিয়ার জন্য না হয়। দুনিয়ার কল্যাণ ও আখিরাতের কল্যাণ উভয়টিই আমাদের কাম্য। পার্থিব জীবনে চেষ্টা সাধনা ও সর্বাত্মক ত্যাগ বিসর্জন উৎসর্গ করার মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণকেই প্রাধান্য দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا

যারা মু'মিন হয়ে পরকাল কামনা করে এবং তার জন্য যথাযথ প্রচেষ্টা চালায় তাদের প্রচেষ্টাই (আল্লাহ্‌র দরবারে) স্বীকৃত হয়। (সুরা বণি ইসরাঈল : ১৯)

আল্লাহ্‌র মাহবুব বান্দারা খোদায়ি ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন বান্দা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তাঁরা আমাদের দিশারি, আলোক বর্তিকা। রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

তোমরা মু'মিনের (আল্লাহ্‌র অলিদের) অন্তরদৃষ্টিকে ভয় করো, কারণ তাঁরা আল্লাহ্‌র নূরের মাধ্যমে দেখতে পান। (তিরমিযি)

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কেরামের শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আ-মি-ন।

লেখক :

অধ্যক্ষ, মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রি), বন্দর, চট্টগ্রাম
খতিব, কদম মোবারক শাহী জামে মসজিদ, মোমিন রোড, চট্টগ্রাম।

আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে 'ফানা আনিল হাওয়া'-র ভূমিকা

✍ মুহাম্মদ জুলফিকার আলী চৌধুরী

'হাওয়া' শব্দটি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন

اَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

আপনি কি দেখেছেন ঐ ব্যক্তিকে যে তার প্রবৃত্তিকে ইলাহ বা উপাস্য বানিয়েছে। (সূরা জাছিয়া : ২৩)

এর বহুবচন আহওয়া (اهواء)। এটাও পবিত্র কুরআনের অনেক স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨﴾

আপনি ঐ লোকদের কামনার অনুসরণ করবেন না যারা জানে না। (সুরা জাছিয়া : ১৮) মূলতঃ শব্দটির অর্থ হলো ميل النفس الي الشهوة বা কামনার প্রতি আত্মা ঝুঁকে যাওয়া। মানুষের নফস বা আত্মা তিন প্রকার : যথা আম্মারা, লাওয়ামা, মুৎমায়িন্না। তন্মধ্যে 'আম্মারা' হলো মন্দ কাজ তথা আল্লাহ তা'য়ালা ও রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'এর আনুগত্যের বিপরীত নির্দেশকারী আত্মা। 'নফ্স' যখন অবাধ্যতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন পবিত্র কুর'আন মজিদের বাণী:

ذَرْهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُوْنَ ﴿٩١﴾

"আপনি তাদেরকে তাদের বেহুদা কাজে খেলার জন্য ছেড়ে দিন (সূরা আনআ'ম : ৯১)" তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে তাদের মতো চলার অবকাশ দিয়ে দেন এবং সুদৃষ্টি তুলে নেন। এতে করে তার মধ্যকার চার উপাদান তথা আব-আতাশ–খাক–বাদ (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) ভারসাম্যহীন হয়ে উগ্র ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়, বিবেক বিনষ্ট হয়ে কুপরামর্শ দিতে থাকে এবং ইন্দ্রিয়গুলো নির্দ্বিধায়

নিখুঁতভাবে নফসের হুকুম পালন করে যায়। এর ফলে তার মধ্যে অহংকার, দাম্ভিকতা, আনাচার, অপরের সাথে শত্রুতা, অবাধ্যতা, চুরি–ডাকাতি, ব্যভিচার, সমকামিতা, মাদক সেবন, রক্তপাত, মিথ্যাচার, প্রতারণা, জবরদখল, লুণ্ঠন, আত্মসাৎ, ক্রোধ, ওয়াদাভঙ্গ করা, অকৃতজ্ঞতা ইত্যাদি পাপাচার প্রকাশ পায় এবং দান-খয়রাত, নামায-রোযা, ফিৎরা, হজ্ব, কোরবানি, আতিথেয়তা, তিলাওয়াতে কুর'আন, ইবাদত, হিতোপদেশ, আল্লাহর যিকর (স্মরণ), পরকালের ফিকির (চিন্তার), শরিয়তের বিধান অনুসরণ, তরিকতের মৌলিক বিষয় প্রতিপালন, হাকিকতের পথচলা, মা'রেফতের লক্ষ্যে পৌঁছা এগুলো কিছুই তার দ্বারা হয় না। (আয়নায়ে বারি, পৃ. ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫)

কোনো মানুষ যদি আধ্যাত্মিক পথ অনুসরণ করে পরমাত্মার সাথে মিলতে চায় সে প্রয়াসের (سلوك) প্রথম ধাপ হলো সাইর ইলাল্লাহ (سير الي الله) যার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো সাইর ফিল্লাহ (سير في الله) , বা আল্লাহর দিকে ভ্রমণ ও আল্লাহ্‌র মাঝে ভ্রমণ। আল্লাহ্‌র দিকে ভ্রমণ কখনও সম্ভব নয় যদি না 'ফানায়ে ছালাছা' (তিনটি বিনাশ) অর্জিত হয় যথা : খলক, হাওয়া, ইরাদা, বা সৃষ্টি, কামনা, ইচ্ছা (প্রাগুক্ত, পৃ.১৮)

গাউসুল আ'যম আব্দুল কাদের জিলানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) 'ফুতুহুল গায়ব' শরীফে বলেন :

اذا مت عن الخلق قيل لك ورحمك الله واماتك عن الهوي واذا مت عن هواك قيل لك اماتك الله عن ارادتك ومناك-

হে আল্লাহর পথের পথিক, যখন তুমি মানুষদের থেকে মরে গেছ অর্থাৎ তাদের দেওয়া না দেওয়া, প্রশংসা-নিন্দা ভালো–মন্দ তথা সব অবস্থা থেকে তুমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলা এবং তাদের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব সবকিছু তোমরা নিকট সমান হয়ে গেল তখন তোমাকে স্বপ্ন, ইলহাম, ইঙ্গিত, বা অন্য কোন উপায়ে মহান হক তা'য়ালার পক্ষ থেকে বা ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হবে, আল্লাহ তোমাকে আরও উচ্চ মর্যাদা ও অধিক সম্মান দিয়ে দয়া করুন এবং তোমাকে 'হাওয়া' থেকে মৃত্যু দান করুন। চিত্তের কামনা ও পার্থিব সুখ-বিলাস থেকে এমনভাবে আত্ম বিনাশ করো যেন প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ তোমারই অনুগামী হয়ে যায়; তোমার কিঞ্চিৎ বিরোধিতা না করে। (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯)

'ফানা আনিল হাওয়া' অর্জনের উপায় :

কুপ্রবৃত্তি দমন করে 'ফানা' অর্জনের উপায় হলো 'জিহাদ' বা প্রচেষ্টা। আধ্যাত্মবাদীদের দৃষ্টিতে জিহাদ তিন প্রকার, যথা :

(১) কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ; সেটা বাহ্যিক যুদ্ধ। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

يُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

তাঁরা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। (সূরা মায়েদা : ৫৪)

(২) বাতিলপন্থিদের বিরুদ্ধে, যা জ্ঞান ও দলিলের মাধ্যমে সম্পাদন হয়। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ

আপনি তাদের সাথে উত্তম পন্থায় মোকাবিলা করুন। (সূরা নাহল : ১২৫)

(৩) 'নফ্সে আম্মারা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ؕ

যারা আমার রাস্তায় যুদ্ধ করবে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ প্রদর্শন করব। (আনকাবুত : ৬৯) এ তিন প্রকারের মধ্যে সর্বোত্তম হলো জিহাদুন নফ্স বা তৃতীয় প্রকার। রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন :

افضل الجهاد جهاد النفس

সর্বোত্তম জিহাদ হল 'নফ্স' এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। (তিরমিযী/ মোকাশেফাতুল কুলুব, পৃ. ২০)

ইয়াহইয়া ইবনে মা'য রাযী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন : ইবাদত এবং রিয়াযতের মাধ্যমে তুমি আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। রিয়াযত হলো : (ক) নিদ্রা ত্যাগ করা, (খ) কথা কম বলা, (গ) মানুষের কষ্ট লাঘব করা, (ঘ) কম আহার করা।

স্বল্প নিদ্রাতে ইচ্ছা শক্তির (ইরাদার) বিশুদ্ধতা তৈরি হয়। অল্প কথনে বিপদ থেকে নিরাপত্তা অর্জন, অপরের কষ্ট লাঘবে লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়। অল্প আহারে কুপ্রবৃত্তির মৃত্যু ঘটে। অধিক আহারে কলব পাষাণ হয়ে যায় এবং জ্যোতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ক্ষুধার মাধ্যমে হিকমাহ বা প্রজ্ঞার আলো বা 'নুর' সৃষ্টি হয়, পক্ষান্তরে পরিতৃপ্তি আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'য়ালা তিন ধরনের প্রাণী সৃষ্টি করেছে; যথা : তিনি ফেরেশতা সৃষ্টি করে তাদেরকে 'আকল' বা বিবেক দিয়েছেন, কিন্তু শাহওয়াত বা প্রবৃত্তি দেননি; পশু সৃষ্টি করে তাদেরকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন কিন্তু আকল দেননি; মানুষ সৃষ্টি করে তাদেরকে আকল ও শাহওয়াত তথা বিবেক ও প্রবৃত্তি দু'টোই দিয়েছেন। অতএব, তার প্রবৃত্তি যদি বিবেকের চেয়ে প্রবল হয় তা হলে সে পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আর বিবেক যদি প্রবৃত্তির চেয়ে প্রবল হয় তা হলে সে ফেরেস্তার চেয়ে উত্তম। (প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮, ১৯)

বেলায়ত অর্জন :

'ফানা আনিল হাওয়া' সহ অপর দুই 'ফানা' (খালক ও ইরাদা) অর্জন হলে কেনো ব্যক্তির 'বেলায়তের ইহসান' অর্জিত হয়। যা আল্লাহ তা'য়ালার বিশেষ বান্দাগণ লাভ করে থাকেন। অলির পরিচয় দিতে গিয়ে 'শরহে আকাইদে নাসাফিতে বর্ণিত :

الولي هو العارف بالله تعالي وصفاته حسب ما يمكن المواظب علي الطاعات المجتنب عن المعاصي المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات –

অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্র সত্তা ও গুণাবলির যথাসাধ্য মা'রিফাতা বা পরিচয় লাভ করা; নেক আমলসমূহ নিয়মিতভাবে অধ্যবসায় সহকারে পালন করা, এমনকি মুস্তাহাবও বাদ না দেওয়া, পাপাচার থেকে বিরত থাকা এবং আয়েশ ও ভোগবিলাসে ডুবে যাওয়া পরিহার করা– এ গুণাবলি যিনি ধারণ করবেন তিনি আল্লাহর অলি।

অতএব, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনের অন্যতম অপরিহার্য উপায় হলো 'ফানা আনিল হাওয়া' এর ধাপ অতিক্রম করা।

লেখক :
উপাধ্যক্ষ
সোবহানিয়া আলিয়া কামিল (এমএ) মাদ্‌রাসা
৩১৫, আসাদগঞ্জ রোড, পাথরঘাটা, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

আত্ম অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহারে, 'ফানা আনিল ইরাদা'র বাস্তব অনুশীলন : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

✍ ড. মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

১. **প্রারম্ভিকা :** মানব চরিত্রের উৎকর্ষের জন্য কিছু বিষয় অর্জন এবং কিছু বিষয় বর্জনের শিক্ষা দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদর্শ চরিত্রবান হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছেন। নৈতিক দিক থেকে উন্নত করার মানসে অর্জনীয় গুণাবলির মাঝে সিদক্ বা সত্যবাদিতা, সবর, শোকর, আদল, ইহসান, ক্ষমা, উদারতা, বদান্যতা, বিনয়-নম্রতা, আত্মসংযম, আমানতদারিতা, মিতব্যয়িতা, লজ্জাশীলতা, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ, প্রজ্ঞা, বীরত্ব, অতিথিবৎসলতা, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসা ইত্যাদি গুণ অর্জনে উৎসাহিত করেছেন।

অপরদিকে, বর্জনীয় বিষয়গুলো যেমন মিথ্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, কৃপণতা, ধোঁকা-প্রতারণা, রাগ ও ক্রোধ, গিবত, সুদ, ঘুস, অশ্লীলতা, পদ ও সম্পদের প্রতি অদম্য মোহ, অপবাদ, অকৃতজ্ঞতা, ঠাট্টা-বিদ্রুপ, কুধারণা, যুলুম-অত্যাচার, চোগলখুরী, সংকীর্ণতা, ছিদ্রান্বেষণ, উপহাস, স্বার্থপরতা, লোভ-লালসা, কু-ধারণা, অপচয় প্রভৃতি বর্জন করে একজন অদর্শ চরিত্রবান ও নৈতিক শিক্ষায় বলিষ্ঠ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে উৎসাহিত করেছে ইসলাম। বিশেষতঃ আত্ম অহংকার, আত্মম্ভরিতা, গর্ব, দম্ভ, দর্প, অহমিকা আমিত্ব, বড়াই প্রকৃত মুমিন-মুসলিম হওয়ার অন্যতম অন্তরায়।

আর মানব চরিত্রের উপযুক্ত নেতিবাচক দিক গুলোর পরিহারে 'উছুলে সাব'আ (The Seven Ascetic Method)'র অন্যতম অনুষঙ্গ ফানা আনিল ইরাদা (Annihilation from own will) অন্যতম সহায়ক। কেননা বান্দাহ 'ফানা আনিল ইরাদা' চর্চা করে ব্যক্তি চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আল্লাহভীতি সৃষ্টি এবং আখিরাতে তাঁর দরবারে পাপ-পুণ্যের হিসাবের কাঠগড়ায় জবাবদিহিতার ভয় মনে সৃষ্টি করে সামাজিক অনাচার অবক্ষয় ও পাপাচার কামাচার থেকে বাঁচার এক অনন্য অনাবিল ও অবারিত সুযোগ লাভ করে।

বিষয় বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা বা গুরুত্ব অনুধাবনে কতিপয় শব্দ বিশ্লেষণ ; বিষয় বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবনে উপযুক্ত প্রবন্ধের শিরোনামে বর্ণিত কতিপয় শব্দ তথা-অনুষঙ্গের সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি।

২. **আত্ম অহংকার ও আত্মম্ভরিতা :** মানবচরিত্রের মাঝে এমন কিছু স্বভাব-চরিত্র রয়েছে যা নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয়। আর এসব স্বভাব-চরিত্র আখলাকে সায়্যিআহ বা আখলাকে জামিমা হিসেবে বিবেচিত। এ অসৎচরিত্র ও নৈতিকতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের অকল্যাণ ও ক্ষতির বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ্য় বিশদ আলোচনা বিদ্যমান; যেমন রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চরণ করে বলেন :

لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظرى .

"দুশ্চরিত্র ও রূঢ় স্বভাবের মানুষ আদৌ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না"[১]

নবিজি হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যত্র বলেন:

وإن ابغضكم إلَى و ابعدكم مِنّى مساويكم اخلاقًا .

"তোমাদের মাঝে সে ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় এবং আখিরাতে ও আমার নিকট থেকে সবচেয়ে দূরে থাকবে, যার চরিত্র অসৎ হিসেবে বিবেচিত।"[২]

আর এসব অসৎচরিত্রের মাঝে আত্ম আহংকার ও আত্মম্ভরিতা বিশেষভাবে আলোচিত। আত্ম অহংকার মূলত : দুটো শব্দের পাশাপাশি সংমিশ্রণ যথা "আত্ম" যার মানে নিজ, স্বীয় যার ইংরেজি পরিভাষা Pride, Importance, Consciousness, esteem।[৩] এসব শব্দের পূর্বে Self শব্দের সংযোজনে বর্ণিত শব্দ গুলো যথাক্রমে Self-Pride, Self-Importance, Self-Consciousness, Self-esteem ইত্যাদিতে পরিণত হয়।[৪]

---

[১] সুলাইমান ইবনুল আশআছ আবুদাউদ আস্-সিজিস্তানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) সুনানু আবিদাউদ, বাবু ফি হুসনিল খুলুক, পৃ: ৯৫৫, হা. ৪৮০১.

[২] ক. মুসনাদু আহমদ, হা. ১৭০৭৭, খ. জামিউত তিরমিযি, হা. ১৯৪১
গ. সহিহ ইবনে হিব্বান, হা. ৪৮৩ ঘ. শু আবুল ইমান হা. ৪৭৬০

[3] Thomas Patrick Hughes, Dictionary of Islam.

[4] Zillur Rahman Siddiqui, English-Bengali Dictionary. (Dhaka : Bangla Academy, 1993) P. 607.

এ ছাড়া Self-Conceited, Self-Glorification ইত্যাদিও এ শব্দের ইংরেজি পরিভাষা রয়েছে।[৫]

আরবিতে تمجُّد، مُعجب، غروى، عجب ইত্যাদি পরিভাষায় ব্যবহৃত হয়।[৬]

আবার অহংকার শব্দের আরবি পরিভাষা হলো التكبر، الفخر، الكبرياءُ যা শব্দে[৭] ও ব্যবহৃত হয়। অহংকারের আভিধানিক অর্থ হলো অহমিকা, আমিত্ব, গর্ব, দর্প, দম্ভ, বড়াই, নিজকে বড়ো মনে করা[৮] ইত্যাদি। পরিভাষায় অহংকার বলা হয়। অন্যের উপর নিজেকে মর্যাদাবান মনে করা কিন্তু সেটি তার মধ্যে নেই বলেই তাকে তাকাব্বুর বা অহংকার বলে।[৯]

ইমাম গাজ্জালি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন : কোনো বিশেষ গুণ বা দক্ষতা থাকলে সে গুণটির কারণে যদি নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং যাদের মাঝে এ গুণটি নেই কিংবা পরিমাণে কম আছে, তাদেরকে নিজের থেকে হীন, নীচু ও তুচ্ছ মনে করাকে আত্মম্ভরিতা বলে।[১০] আর সে আত্মাভিমান কে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চাল-চলন, কথা-বার্তা ও অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে প্রকাশ করা হলো অহংকার[১১] التكبُّـر।

ইমাম রাগিব ইস্‌ফাহানি (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) বলেন :

الفخر المباهات فى الاشياء الخارجة عن إلانسان كا لمال والجاه .

মানুষের মাঝ থেকে বাহ্যিক কিছু প্রতিযোগিতার ভাব প্রকাশ পাওয়াকে অহংকার বলে।[১২]

ড. ইবরাহিম আনিস বলেন :

---

[5] Mohammad Ali, Bengali-English Dictionary (Dhaka: Bangla Academy, 1994), P. 148

[৬] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মু'জামুল ওয়াফী (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, জানু: ২০১৪) পৃ: ১৫২

[৭] ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, আখলাক ও নৈতিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি (ঢাকা: ইফাবা ২০১৮) পৃ: ১৭৩

[৮] ড. মুহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, প্রাগুক্ত।

[৯] প্রাগুক্ত

[১০] মুহাম্মদ আল গাজ্জালি, ইহ্‌ইয়াউ উলুমিদ-দ্বীন, অনুবাদ : মওলানা ফজলুল করিম (ঢাকা : আবু হামেদ ভূঁইয়া, ১৯৬৩ খ্রি) ৬খ, পৃ: ২৫৮

[১১] মুহাম্মদ আল গাজ্জালি, প্রাগুক্ত

[১২] ইমাম রাগিব আল ইসপাহানি, আল মুফরাদাত ফী গারীবিল কুর'আন, পৃ: ৩৭৬

التكبُّر، التعظم والامتناع عن قبول الحق معاندة .

ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে সত্যগ্রহণের অপারগতা প্রকাশ করাকে আত্তাকাব্বুর বা অহংকার বলে।[১৩]

মুফতি আমিমুল ইহসানের মতে;

الكبرُ ان يرى نفسه فوق غيره فى صفة الكمال .

নিজেকে অন্যের উপর পূর্ণাঙ্গ গুণের প্রভাব দেখানোকে অহংকার বলে।[১৪]

Thomas Patrikc Hughes বলেন :

KIBR (كبر): Pride; "Hightiness" with regard to mortal man, it is considered a vice; but with regard to the infinite God, it is held to be are of this attributes. Al-Kabir, "The Great one"

অর্থাৎ মরণশীল মানুষের ক্ষেত্রে অহংকারকে পাপ হিসেবে পণ্য করা হয় কিন্তু অসীম সৃষ্টিকর্তা ক্ষেত্রে একে সৃষ্টিকর্তার গুণ অথবা সিফাত হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৫]

অপরদিকে, আত্মম্ভরিতা মূলত : একটি বিশেষ্যমূলক শব্দ; যার প্রতিশব্দ যথাক্রমে আত্ম সর্বস্বতা, অহংকার, দম্ভ, আত্মপরতা, আড়ম্বর, অস্মিতা, আত্মপ্রাধান্য, আত্মশ্লাঘা কিংবা অহংবোধ।[১৬] যার ইংরেজি পরিভাষা হলো যথাক্রমে Arrogance, Pride, Vanity, bragging, Self-seeking, Self-interested, Pompsity[17] ইত্যাদি।

যার আরবি পরিভাষা হলো যথাক্রমে:

خُيَلاء، أنَانية، تبجُّ، تفاخر، تباهى، مختال، أنانى . [১৮] ইত্যাদি।

---

[১৩] ড. ইবরাহিম আনিস, আলমিসবাহল মুনির, ২খ, পৃ: ৫২৩

[১৪] ক. আল্লামা মুফতি আমিমুল ইহ্সান মুজাদ্দেদী, কাওয়ায়িদুল ফিক্হ. পৃ. ২৩৫
খ. মুজামু লুগাতিল ফুকাহা. পৃ ১৪২

[15] Thomas Patrick Hughes, Dictionary of Islam (Delhi : Rupa & Co. Fourth Impression, 1999), P. 277

[১৬] ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি নভেম্বর-১৯৯২ খ্রি) পৃ: ৭৭

[১৭] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত

[১৮] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, প্রাগুক্ত

মূলত, অহংকার, গর্ব ও আত্মম্ভরিতা এগুলো হলো নিন্দনীয় স্বভাব ও দুশ্চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি নিজকে অন্যের তুলনায় বড়ো জ্ঞান করে এবং অন্যকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট মনে করে। দুনিয়ার ইতিহাসে সর্বপ্রথম যে অহংকার ও দাম্ভিকতা প্রদর্শন করেছে সে হলো বিতাড়িত শয়তান। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শয়তানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের ব্যাপারে বলেন :

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِىْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

"সে (শয়তান) বলল যে, আমি তাঁর (আদম আলাইহিস সালাম) থেকে উত্তম। আমাকে আগুন থেকে আর তাঁকে মাটি থেকে সৃজন করেছেন।"[১৯]

অর্থাৎ, শয়তান আল্লাহকে বুঝাতে চেয়েছে মাটি থেকে আগুন মর্যাদাগত দিক থেকে উত্তম। আল্লাহ মারদুদ শয়তানের এ ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সহ্য করেন নাই; সাথে সাথে ঘোষণা করলেন :

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ

তুমি এ স্থান থেকে নেমে যাও, এখানে থেকে অহংকার করবে তা হতে পাওে না। সুতরাং বের হয়ে যাও। তুমি অধমদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।[২০]

অহংকারী লোক সাধারণত অহমিকা ও আত্মম্ভরিতায় দিশেহারা হয়ে থাকে। তারা শুধু বড়ো মনে করেই ক্ষান্ত হয় না। অধীন অন্য লোকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করতে তারা সদা সচেষ্ট থাকে। ওরা হয় স্বেচ্ছাচারী, স্বৈরাচারী, দুর্ধর্ষ-দুর্বিনীত। এরা কখনও আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পেতে পারেনা। আল্লাহ ইরশাদ করেন :

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا .

নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে, যারা দাম্ভিক, অহংকারী এছাড়া অহংকারী, দাম্ভিক ব্যক্তি আদৌ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে না।[২১] যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) নবিজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন :

---

[১৯] আল কুর'আন সূরা : ৭ (আল আ'রাফ) : ১২
[২০] আল কুর'আন সূরা : ৭ (আল আরাফ) : ১৩
[২১] আল কুর'আন সূরা: ৪ (নিসা) : ৩৬

لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرةٍ من كبـــرٍ.

"যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।[২২]

৩. **'ফানা আনিল ইরাদা'র আলোকে আত্ম অহংকার ও আত্মম্ভরিতা পরিহার :**
বাংলাদেশে সুফিবাদ চর্চার উর্বর ক্ষেত্র 'মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ'। ইহজাগতিক ও পারমার্থিক উৎকর্ষ সাধনে এ দরবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা সর্বজনবিদিত। মহত্তম এ তরিকার প্রবর্তক গাউসুল আজম মাইজভাণ্ডারী ইমামুল আউলিয়া হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ মানুষের আত্মশুদ্ধির কিছু মৌলসূত্র প্রত্যাবর্তন করে গেছেন। তার নাম "উছুলে ছাব'আ" বা 'সপ্তকর্মপদ্ধতি'। এটি মূলত একজন মানুষের সহজাত কু-প্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে সাধন-প্রণালি যুগপৎ বস্তুগত ও ভাব সাধনার নির্যাসকে ধারণ করে জাগতিক ও পারলৌকিক জীবনের নিহিতার্থকে গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে।
এ 'সপ্তপদ্ধতি'র অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে "ফানা আনিল ইরাদা"। ইরাদা (ارادة) মূলত : এক বচন যার বহুবচন হলো إرادات আর অর্থ হলো ইচ্ছা বাসনা, অভিপ্রায়। আরও কিছু আরবি পরিভাষা হলো نية، مشيئه، رغبة، مصد[২৩] ইত্যাদি।

ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে desire, purpose, will, wish[২৪] ইত্যাদি।
পরিভাষায় "খোদার ইচ্ছাশক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া এবং নিজের ইচ্ছা বা বাসনাকে খোদার ইচ্ছার নিকট বিলিন করার নামই হচ্ছে ফানা আনিল ইরাদা।[২৫]
আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দেয়ার মাধ্যমে বান্দা তার পদযুগল কর্ম প্রচেষ্টায় অটুট রাখে। সুখ-দুঃখ, বিপদ-আপদ, অস্থির ও হতাশায় সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেন :

---

[২২] সহীহ মুসলিম হা: ১৩৩, সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৬৮, তিরমিযী: ১৯২২, ইবনু মাযাহ: ৫৮, মুসনাদু আহমদ: ৪০৮৩

[২৩] ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল মুজামুল ওয়াফী (ঢাকা : রিয়াদ প্রকাশনী, জানু ২০১৪), পৃ : ১৫২

[24] Zillur Rahman Siddiqui, Bangla-Academy, English-Bangla Dictionary (Dhaka : Bangla Academy, August 1993), P. 910

[২৫] বেলায়তে মোত্‌লাকা পৃ : ৭০

إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আপনি বলুন; আমার সালাত, আমার কোরবানি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বনিয়ন্ত্রা আল্লাহ্রই জন্য।"[২৬]

বিশ্লেষণ অর্থে আমরা এতটুকুন বলতে পারি "فناء عن الإراده" র বিষয়টি মূলত : কুরআন-সুন্নাহ্র ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। আধ্যাত্মিকতার পরিভাষায় যা নিঃসন্দেহে تسليم ও رضا অর্জনের অনন্য মাধ্যম। এর মাধ্যমে ব্যক্তি যাপিত জীবনে নিজ ইচ্ছা, অভিপ্রায়, আকাঙ্খা, অভিলাষ- আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতিকে খালিক-মালিক রাজ্জাকু জুল কুওয়াতিল মাতিন- এর নিকটই সম্পূর্ণ বিলীন করে সর্বময় অহংবোধ, দাম্ভিকতা, আত্মম্ভরিতা ও আত্মশ্লাঘা মনোভাব থেকে সুশীল পর্যায়ে উন্নীত করবে। সুগভীরে আমরা যদি লক্ষ করি তা হলে বোঝা যায় এটিই সুফীবাদের অনন্য শিক্ষা ও সর্বান্তঃকরণ অনুশীলন ও অনুকরণ।

পরিসমাপ্তি :

পরিশেষে বলা যায় 'ফানা আনিল ইরাদা'র মাধ্যমে "আমিত্ব" বা অহমের বিলোপ সাধনের মাধ্যমে আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয়। আর এ দুরূহ কাজটি করতে পারলে যাপিত জীবনে মারা-মারি, হানাহানি, দাঙ্গা- হাঙ্গামা, সন্ত্রাসী মনোভাব, আত্মঅহংকার, আত্মম্ভরিতা, লোভ-লালসা সবকিছুকে অনায়াসে পরিহার করা যায়। এক কথায় বলা যায় :

To surrender completely with the will of Allah, Having to self-desire is the third method in Maizbhandari Tariqa or Sufism. Through this innihilation, a sufi innihilates in the essence of Allah which brings about attainment only through surrendering his will into Allah's will.

লেখক, গবেষক ও প্রাবন্ধিক;
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), ফয়জুল বারী ফাযিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা
কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম।
E-mail : dr.krahman38@gmail.com

[২৬] আল কুরআন সূরা (আনআম) : ১৬২

ইনসানে কামেল (পরিপূর্ণ মানুষের) সন্ধানে মাইজভাণ্ডারের 'গাউছিয়ত নীতি'র আলোকে মৌলিকভাবে ঐশী সংযোগেই মেলে যে অমূল্য রতন

✍ ড. সেলিম জাহাঙ্গীর

তথ্য সংকেত

গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী হযরত মওলানা শাহ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) (১৮২৬–১৯০৬) কর্তৃক প্রবর্তিত তরিকায়ে মাইজভাণ্ডারীর নীতিমালাই 'গাউছিয়ত নীতি'। তাঁর মনোনীত সাজ্জাদানশিন, তদীয় পৌত্র ও অছি, 'খাদেমুল ফোক্‌রা' খ্যাত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (১৮৯৩–১৯৮২) কর্তৃক বিশ্লেষিত এই 'গাউছিয়ত নীতি' বর্ণিত হয়েছে মৌলিকভাবে তাঁর রচিত দুটো গ্রন্থে– (১) ১৯৭৪ এ প্রকাশিত তদীয় জীবনের সর্বশেষ গ্রন্থ *'মানব সভ্যতা'* এবং জীবনের প্রথম গ্রন্থ ১৯৬০ সালে প্রকাশিত *বেলায়তে মোত্‌লাকা* গ্রন্থে। এ দুটোরই প্রকাশক প্রকাশ স্থান গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, ভাণ্ডার শরীফ, ফটিকছড়ি চট্টগ্রাম। আর মাইজভাণ্ডারী গানের Reference উদ্ধৃত হয়েছে ২০১৯ সালে 'বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি' থেকে প্রকাশিত তিন শতাধিক টীকা ভাষ্যসহ ড. সেলিম জাহাঙ্গীরের গবেষণা গ্রন্থ *রমেশ শীল মাইজভাণ্ডারী গান সমগ্র* গ্রন্থ থেকে আর তরিকা বিষয়ে বাংলা একাডেমী প্রকাশনা *মাইজভাণ্ডারী সন্দর্শন* (১৯৯৯)। 'গাউছিয়ত নীতি'র বিস্তারিত তাত্ত্বিক ও বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের থেকে সহযোগিতা নিয়েছি 'গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিলে'র বিশেষ প্রকাশনা ২০২০ সালে প্রকাশিত DIRI এর *উছুলে ছাবয়া* স্মারক গ্রন্থের।

দার্শনিকতার আলোকে তাত্ত্বিকভাবে প্রথমেই মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় এভাবে :

১. বাস্তবতার আলোকে পরিপূর্ণ মানুষের (ইনসানে কামেলের) প্রকৃত সংজ্ঞা কী?
২. এই অতি পুরাতন অথচ সর্বকালের গভীরতম জিজ্ঞাসার বিষয়ে নাস্তিক আর আস্তিকের চিন্তা ধারা কি একই ধারায় প্রবাহিত?
৩. ইসলাম ধর্মের বাইরে অন্যান্য ধর্মে ইনসানে কামেলের কনসেপ্ট কী?

৪. শরিয়তি ধারায় একজন পাক্কা মুসলমানের চিন্তা-চেতনার স্তরের আলোকে এর রূপরেখা।
৫. সুফি সাধনার ও সাহিত্যের ধারায় ইনসানে কামেলের কনসেপ্ট।
৬. সুফি সাহিত্যে ও সুফি সাধনার আলোকে মাইজভাণ্ডারীয়া তরিকায় এর রূপরেখা।
৭. সুনির্দিষ্টভাবে মাইজভাণ্ডারী তরিকার তাত্ত্বিক ভিত্তি 'উছুলে ছাবয়া'র প্রলম্বিত রূপ হিসাবে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর চিরায়ত শাশ্বত (হাশরতক জারি থাকার) গাউছিয়ত নীতির আলোকে এর জীবনঘনিষ্ঠ শতভাগ কার্যকর ভূমিকার প্রসঙ্গ।
৮. বাংলার লোক সঙ্গীতের আলোকে মাইজভাণ্ডারী সঙ্গীতে এর প্রতিফলিত রূপ।

পবিত্র কুরআনের সর্বমোট ১১৪ টি সূরার মধ্যে ন্যূনতম ৬০ টি সূরায় আলোচনা এসেছে ইনসান বা মানুষ সম্পর্কে। গভীর রহস্যের আবরণে যুগপৎ অমিত সম্ভাবনা ও বিপজ্জনক আশঙ্কার দোলাচলে এক অবিস্মণীয় অভাবনীয় সৃষ্টি মানুষ। বলাবাহুল্য, সৃষ্টির শুরু থেকে মানব মনে এক চির রহস্যপূর্ণ অনিঃশেষিত প্রশ্ন আমি কে? দার্শনিকতার তত্ত্বীয় দিক থেকে দার্শনিক সক্রেটিস একে আরও গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে গেলেও জীবনঘনিষ্ঠ বাস্তবতার আলোকে প্রকৃত সমাধানের পথ সতত অধরাই থেকে যায়। সময় আর তত্ত্বের সাথে পাল্লা দিয়ে দার্শনিকতার গোলক ধাঁধারও যেন শেষ নাই।

নিজেকে জানো : মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় আত্ম জিজ্ঞাসার শাশ্বত চিরায়ত পদ্ধতি 'নিজেকে জানো'। প্রবহমান ধারায় বিশ্ববিশ্রুত এক আপ্তবাক্য সক্রেটিসের 'Know thyself' মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী লোকমান হাকিমও এ কথা বলেছেন তাৎপর্যপূর্ণভাবে। 'বেদে'ও এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যান মগ্ন থাকতেন এ আত্ম জিজ্ঞাসার অনন্ত সন্ধানে। আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি হিসেবে মানুষ যদি নিজের উৎপত্তি, বিকাশ এবং চূড়ান্ত পরিণত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে পারে তখনই তার জন্মের সার্থকতা এবং একইসাথে স্রষ্টাকে জানার দ্বার উন্মোচন। এ কারণে পবিত্র হাদিসে বলা হয়েছে : 'মান আরাফা নাফছাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বাহু' যে নিজেকে চিনতে পেরেছে সেই তার স্রষ্টাকে চিনতে পেরেছে। বলাবহুল্য, এখানেই মানুষ সৃষ্টির সার্থকতা, স্রষ্টা-সৃষ্টির গোপন রহস্যের লীলাখেলা।

এই প্রেক্ষাপটে মানুষের মৌলিক অনন্ত আত্ম জিজ্ঞাসার একান্ত জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্নের তথোধিক জীবন ঘনিষ্ঠ পথ নির্দেশিকা, রূপরেখা বিশ্বস্ততার সাথে খুঁজে পাওয়া যায় গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) (১৮২৬-১৯০৬) প্রবর্তিত মাইজভাণ্ডারী তরিকার 'গাউছিয়ত নীতিতে'। গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) প্রবর্তিত 'গাউছিয়ত নীতি' বিশ্ব মানবতার সামনে এই চিরায়ত শাশ্বত কুরআনিক সত্যিটিকেই স্থান-কাল-পাত্রের আলোকে উপস্থাপন করেছে একান্ত জীবনঘনিষ্ঠ পন্থায়; যার ফলে মৌলিক ভাবে মানব সভ্যতা তার মৌলিক শেকড়, আদি ও অকৃত্রিম যোগসূত্র খুঁজে নিতে সহজ হয়। অন্ধকারে পথ হাতড়ানো নয়, নিকষ কালো ঘরে কালো বিড়াল সন্ধানের নিষ্ফল প্রয়াস নয়; জাগতিক জ্ঞান-বৃদ্ধির প্রাধান্য বা অহমিকায় রহস্য-ভরপুর দিগন্ত প্রসারী বিরাট-বিশাল জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ ও বিচরণেও নিজেকে ঠিক রাখার থেকে চোরাবালিতে পড়ে, চোরাগলিতে ঢুকে বিভ্রান্তি আর বিভ্রাট নয়; জাগতিক পাণ্ডিত্য, দার্শনিক, অহমিকার সম্পূর্ণ বিপরীতে অজ্ঞতা ও মূর্খতার বিলোপ ঘটিয়ে সত্যজ্ঞান উন্মেষের মূল চাবিকাঠি হলো স্রষ্টার সাথে যোগসূত্রের মূল জায়গাটিকে পরিচিহ্নিত করে তা ঝালাই করে নেওয়া। আর এতেই দ্বার উন্মোচিত হবে প্রকৃত জ্ঞান রাজ্যের, নিজেকে জানার সিংহ দ্বার উদঘাটন।

পূর্বাপর সকল বিবেচনায় মানব সভ্যতার চিরায়ত শাশ্বত অনন্ত জিজ্ঞাসা Know thyself এর যথার্থ পঠন-পাঠনের উন্মুক্ত বাতায়ন (সিংহদ্বার) উন্মোচনের বিকল্পহীন মৌলিক ক্ষেত্র বা ধারকই হলো 'কলব'।

কলব : আভিধানিক অর্থ পরিবর্তনশীল। পরিচর্যার প্রেক্ষিতে চরম উৎকর্ষ সাধনের আহোরাত্রিক অনুশীলনে নিত্য উন্নততর পর্যায়ে পরিবর্তন ঘটে বলে এই নামকরণ। পবিত্র হাদিসের বর্ণনা মতে, 'অবশ্যই মানব জাতির শরীরে একটুকরা মাংসপিণ্ড আছে; সেটা যদি সঠিক থাকে তাহলে সমস্ত শরীর ঠিক থাকে আর যদি সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সমস্ত শরীর নষ্ট হয়ে যায়।' নবি করিম (ﷺ) বলেন, তোমরা কি জানো এটা কী? এটা হচ্ছে 'কলব'। অন্য হাদিসের বর্ণনায়, 'মোমেনের কলব আল্লাহ্‌র আরশ'।

মানুষের বাম দুধের দুই আঙ্গুল নীচে কলবের স্থান। মোজাদ্দেদীয়া তরিকার জিকির সাধনায় লতিফার মধ্যে প্রথমটিই 'কলব'। গভীর আধ্যাত্মিক রহস্যে ভরপুর এবং বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনার এ কলব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ১২৪টি আয়াত বর্তমান। কলবকে বলা হয় হেদায়তের কেন্দ্রস্থল, মানব

দেহের রাজধানী। মানব মুক্তির পূর্বশর্তই হলো পরিচ্ছন্ন কলব। চূড়ান্তভাবে বলতে গেলে কলবের নিয়ন্ত্রণ স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে। তাই সূরা তাগাবুনের ১১ নং আয়াত স্মরণযোগ্য : "যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে, তার কলবকে আল্লাহ হিদায়াত দান করবে।"

প্রসঙ্গত প্রণিধানযোগ্যভাবে স্মরণীয় এই স্থানে উপস্থিতির পূর্বশর্ত হলো ঈমান। পবিত্র কুরআনের সূরা তাগাবুনের ১১নং আয়াতে বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে এ ভাবে : "যে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে তার কলবকে আল্লাহ হিদায়াত দান করে।"

ঈমান অর্থ বিশ্বাস। কথা কাজে ও চিন্তায় এর প্রতিফলন ঘটানো। এখানে ৭টি বিষয় মূল অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচ্য (১) আল্লাহ এবং তাঁর জাত ও ছিফাতের (সত্তা ও গুণাবলী)উপর বিশ্বাস করা। (২) ফেরেশতাদের উপর বিশ্বাস। (৩) আল্লাহ্‌র কিতাব সমূহের উপর বিশ্বাস। (৪) রাসুলগণের উপর বিশ্বাস (৫) কেয়ামত দিবসে বিশ্বাস। (৬) তকদির তথা ভাগ্যের উপর বিশ্বাস। (৭) মৃত্যুর পরে হাশরের মাঠে পুনরুত্থানে বিশ্বাস।

বলাবাহুল্য, এখানেই মৌলিকভাবে, সুস্পষ্ট বিভাজনে আস্তিক, নাস্তিক আর সন্দেহবাদীদের অবস্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। অবিশ্বাসী আর সন্দেহবাদীদের জাগতিক জ্ঞান রাজ্যের দার্শনিকতাপূর্ণ পাণ্ডিত্য, বিচিত্র নানা মুখী চিন্তা-ভাবনা, তাত্ত্বিক গবেষণা, আলোচনা-পর্যালোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে শুধু অন্ধকার ঘরে কালো বিড়াল খোঁজার মতো গোলক ধাঁধাতেই ঘুরপাক খেতে থাকে, ঐশী জ্ঞানের চিরায়ত-শাশ্বত মূল সত্য সতত অধরাই থেকে যায়।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিশ্রুত মরমি সাধক, তাত্ত্বিক গবেষক ও ভাষ্যকার মওলানা জালাল উদ্দীন রুমির (রাহমাতুল্লাহে আলাইহি) মসনবি শরিফের নীতি নির্ধারণমূলক বাণীটি প্রণিধানযোগ্যভাবে স্মরণীয় : "বুদ্ধির পথ আঁকাবাঁকা। যারা অনুমান ও কল্পনাবিলাসী তারা জীবন বিনাশকারী বিষতুল্য। পক্ষান্তরে যারা খোদার এলহাম বা বাণীর মালিক, তারা সত্যিকার জীবন সার্থককারী।" (উদ্ধৃত : বেলায়তে মোত্‌লাকা পৃ.১৩৬)

অনন্ত অসীম জ্ঞান জগতের গভীরতম চিন্তা চেতনার অতি সূক্ষ্ম বিষয়টি মওলানা আরও একান্ত জীবনঘনিষ্ঠভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন, "বাহ্যিক অনুভূতি-সম্পন্ন, অর্থাৎ সূক্ষ্মজ্ঞানহীন [ঐশী সংযোগ শূন্য] মানবের জ্ঞান

মুখবন্ধ যুক্ত, তারা আসমানি [খোদায়ি] জ্ঞান-দুগ্ধ আহরণ করতে পারে না।" (বেলায়তে মোত্লাকা, পৃ.১৫৩)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহামূল্যবান উজ্জ্বল মুক্তা সংরক্ষিত থাকে ঝিনুকের শক্ত আবরণের মধ্যে। আর এটি অবমুক্তকরণে প্রয়োজন যত্নকৃত পরিচর্যা। খোদা প্রদত্ত "কলবের" ক্ষেত্রে একই রকম পরিচর্যা প্রযোজ্য। এখানেও একটি মৌলিক প্রশ্ন : এই কলবকে পরিচ্ছন্ন করার পরিচর্যাগত বিদ্যা বা কৌশল কী? এই প্রসঙ্গে 'গাউছিয়ত নীতি'র সারকথাগুলো বিশেষভাবে অনুসরণযোগ্য। মৌলিকভাবে এগুলো ত্রিধারায় বিভক্ত :

১. নির্জন সময়ে নিজের কৃতকর্মের-ভালোমন্দের হালখাতা যাচাই বাছাই।
২. কথায়, কাজে ও চিন্তায় সর্বপ্রকারের অপ্রয়োজনীয়তা পরিহার, পরদোষ পরিহারে নিজ দোষ সংশোধনে আত্মনিয়োগ।
৩. সৃষ্টির রক্ষক, পালক, বর্ধক হিসেবে খোদার মঙ্গলদায়ক শক্তির নিকট কায়মনোবাক্যে আত্মসমর্পণ।

এই আত্মশুদ্ধি প্রক্রিয়ার সাথেই আসে পরবর্তী অধ্যায় : অভিজ্ঞ প্রজ্ঞাবান পথ প্রদর্শকের সর্বাত্মক সহযোগিতা। তাসাউফের পরিভাষায় পীর বা মুর্শিদের হাতে বায়াত। হক্কানি পীরের হাত ধরেই চলতে শুরু করে আধ্যাত্মিক জগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুশীলনের বিরামহীন অপার আনন্দদায়ক অগ্রযাত্রা। এ সময় মুরিদের বাইরের অবয়ব বা খোলস পূর্বের মতো মনে হলেও শরীরের অভ্যন্তরে ঘটতে থাকে নিত্য-নতুন অভাবনীয় পরিবর্তন। বলাবাহুল্য, এক্ষেত্রে যত গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ, তত বেশি প্রয়োজন হয়ে পড়ে পীরের নিবিড় পরিচর্যা এবং একই সাথে মুরিদের সমগ্র সত্তা জুড়ে শ্রম, মেধা, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী শক্তিসমূহের সুসমন্বিত অহোরাত্রিক অনুশীলন। উল্লেখ্য, কলব যথারীতি যথোপযুক্ত মাত্রিকতায় সচল তথা জারি হওয়ার পর শুভ উদ্‌বোধন ঘটে আধ্যাত্মিক নতুন ভুবনের পরবর্তী অপার আনন্দদায়ক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য। যেমন: কলব^{১} > রুহ^{২} > ছের > খফি > আখ্‌ফা > নফ্‌ছ এর সুসমন্বিত অগ্রযাত্রী।

পরিপূর্ণ মানুষের সন্ধানে সঙ্গীত ধারা

দেহতত্ত্ব ভিত্তিক বাউল ধারায় লালন গীতি বনাম 'গাউছিয়ত নীতি'র ধারায় মাইজভাণ্ডারী গান : তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ

যাঁরা বিশ্বাসী কিন্তু বিশ্বাসের বাণী ধারণ-লালন ও প্রকাশের মৌলিক যোগসূত্রের ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক জায়গাটি যুগপৎ তত্ত্ব ও বাস্তবতার আলোকে পরিচিহ্নিত ও যথাযথ মাত্রায় ব্যবহার করার সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ, তারা নিজেদের অজান্তেই এক ধরনের দার্শনিকতার গোলক ধাঁধায় আবর্তিত থাকে প্রায়শ; ফলে তাদের কাছে মৌলিকভাব সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে না। এখানেই মাইজভাণ্ডারী গানের সাথে বাউল ও লালন গানের মৌলিক দূরত্ব; স্রষ্টা-সৃষ্টির সম্পর্কের যোগসূত্রের ব্যাবহারিক দিগ্‌দর্শনের মৌলিক ফারাক। লালনে যেখানে তত্ত্বের নান্দনিক ব্যঞ্জনা পাঠককে সম্মোহিত করে সেখানে মাইজভাণ্ডারী গান তত্ত্ব ও ব্যাবহারিকতার প্রসাদগুণের সুসমন্বয়ে বিমুগ্ধ পাঠককে সম্মোহিত করার পাশাপাশি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে স্রষ্টার সাথে সংযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার জিয়নকাঠি হাতে ধরিয়ে দিয়ে অর্গলমুক্তভাবে স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মিলন ঘটিয়ে দেয় একান্ত জীবনঘনিষ্ঠতায়।

"সবার উপরে মানুষ সত্য" শাশ্বত মানবধর্ম চর্চার অহোরাত্রিক অনুশীলনের প্রবহমান ধারাবাহিকতায় স্রষ্টা-সৃষ্টির মেলবন্ধনের বাণী বাহক বলেই মাইজভাণ্ডারী গান সাধারণের আবরণ ও আভরনে অসাধারণত্বের ব্যঞ্জনায় ভরপুর; রীতিমতে টইটুম্বুর॥

বলাবাহুল্য, এখানে চলমান অন্যান্য লোক সাহিত্যের সাথেও মাইজভাণ্ডারী গানের মৌলিক পার্থক্য। যা ঐশী সংযোগে এ গানের যুগপৎ ঐতিহাসিক এবং Ethnomusicological বিশেষত্বও বটে।

এক কথায়, সক্রেটিসের সেই আপ্তবাক্য Know Thyself এর অনুশীলন প্রক্রিয়ায় তাত্ত্বিক ধারার একান্ত জীবন ঘনিষ্ঠ ব্যাবহারিক প্রয়োগেরই অপর নাম মাইজভাণ্ডারী গান। এ ক্ষেত্রে মাইজভাণ্ডারী গানের নতুন মাত্রিক ব্যাপক আকর্ষণীয় ঐশীজ্ঞান রাজ্যের এই বিষয়টি বাস্তবতার আলোকে সহজে উপলব্ধির জন্য লালন সাঁইয়ের অতি জনপ্রিয় ও আলোচিত দুটো গানের দুটো কলি আর মাইজভাণ্ডারের সূচনা সঙ্গীতটি উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠবে :

(ক) বাড়ির কাছে আরশি নগর
সেথায় এক পড়শি বসত করে
আমি দেখলাম না তারে॥
(খ) খাঁচার ভিতর অচিন পাখি

কেমনে আসে যায়?
ধরতে পারলে মনোবেড়ি
দিতাম তাঁরি পায়॥ – লালন

মাইজভাণ্ডারে উঠেছে তৌহিদের নিশানা
ঘুমাইওনা মায়া-ঘুমে আখের জমানা।
খেদমতে হইলে দাখিল
এলমে লদুন[৩] হবে হাসিল
নিজের রূপ দেখিয়া হবি নিজে দিওয়ানা॥
কলব জিন্দা হয়ে যাবে
মাবুদের দিদার পাবে
দোস্ত-দুশমন সমান হবে, কীসের ভাবনা॥
আছে মাইজভাণ্ডারীর দোয়া
কী সাধ্য **আজরাইলে ছোঁয়া**[৪]
রমেশ বলে লা পরোয়া আছেন মওলানা।

এখানে বর্ণিত 'এলমে লদুন' হলো স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্টির প্রতি সরাসরি জ্ঞান দান। তখন ঐ বান্দার জ্ঞান রাজ্যের দ্বার উন্মোচন হয়ে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে। ফলে 'নিজেকে জানার' এবং একইসাথে 'স্রষ্টাকে জানার' সকল দ্বার হয়ে যায় অবারিত। একইসাথে কলব জিন্দা হয়ে যাওয়ার মানে মানব শরীরের অভ্যন্তরে শুরু হয়ে যায় খোদায়ি জ্যোতির মিলন মেলা।

আর তখন 'আরশি নগরের পড়শি'র দেখা মেলে অবলীলাক্রমে। খাঁচার ভেতরের অচিন পাখির নিত্য আসা-যাওয়ার চিত্রও হয়ে উঠে সতত দৃশ্যমান।

বলাবাহুল্য একজন বাঙ্গালি সুফিসাধক কর্তৃক বাংলার জমিনে প্রবর্তিত একমাত্র তরিকা হিসেবে এই তরিকার ঐতিহাসিক সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক বহুমাত্রিক বিশেষত্ব যেমন আকর্ষণীয় নতুনমাত্রিক উচ্চতর গবেষণার নতুনতর দিঙনির্দেশক; তেমনি স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির মেলবন্ধনের ক্ষেত্রেও এর তাত্ত্বিক এবং ব্যাবহারিক সুসমন্বিত রূপটি ব্যাপক আকর্ষণীয় মাত্রিকতার অপূর্ব অনুঘটক।

এ ক্ষেত্রে গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী (কাদ্দাসা সিররাহুল আজিজ) এর দর্শনের আলোকে 'গাউছিয়ত নীতি'র ধারণ-লালন ও প্রতিপালনে সমগ্র জীবন সত্তায় আত্মনিবেদনের তুঙ্গীয় বহিঃপ্রকাশে পরম যত্নকৃত নিষ্ঠাপূর্ণ